সোনার বাঙলা
৩

॥ তৃতীয় খণ্ড : অতীত ইতিহাস ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৩। আগস্ট, ১৯৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু

প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া,

৩১, মোহনবাগান লেন,

কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা

।। আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি ।।

সূচীপত্র

ইতিহাসের শুরু

বাঙলার ইতিহাসের গোড়ার কাহিনী এখনো অজ্ঞাত। বাঙলাদেশ আর্যপ্রভাবের আওতায় আসার আগেকার কাহিনী আমরা একেবারেই জানি না বলা যায়। তার একটা বড়ো কারণ, সেই সময়ে যারা বাঙলাদেশে বাস করত তারা প্রায় কোনো চিহ্ন না রেখেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতি শুধু বাঙলাভাষায় গৃহীত দু-চারটি শব্দের মধ্যেই টিকে রয়েছে। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাবারও কোনো উপায় নেই। বাঙলা পলিমাটির দেশ। সেদিক দিয়ে বাঙলার মাটি নতুন নরম মাটি। খুব পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাবার আশা বৃথা। তার উপর এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থাও জিনিসপত্র টিকিয়ে রাখতে দেয় না; অল্প কিছুদিনেই সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি—বাঙলার প্রাচীন অধিবাসীরা এখনকার

মতো তখনও বাঁশ-খড়-কাঠের বাড়িঘর তৈরি করত, মাটির বাসনপত্র বানাত। কিন্তু বাঙলার মাটি তাদের কোনো নিদর্শন রাখে নি। তাই এসবের মারফত তাদের যেটুকু খবরও আমরা পেতে পারতাম তাও পাই না।

তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও বাঙলায় কম হয়েছে। উত্তর, পশ্চিম ও পুবের পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্নযুগের মানুষের খোঁজ পাওয়া গেলেও সেখানে মাটি খুঁড়ে খবর বের করার কাজ বিশেষ কিছুই হয় নি। এই খোঁড়ার কাজটা প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে জানবার একটা প্রধান উপায়। এই সব অঞ্চলে মাটি খোঁড়ার কাজ ঠিকমতো হলে প্রাচীনতম বাঙালী সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পাবার আশা করা যায়।

এ পথ ছাড়া আর যেভাবে আমরা প্রাচীন বাঙলার খবর পেতে পারি তা হল পুঁথিপত্র থেকে। সেখানেও অসুবিধা। প্রাচীন বাঙালী লিখতে জানত না। লিখিত খবর পাওয়া যায় একমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও জৈন-বৌদ্ধদের লেখা বই থেকে। কিন্তু সে খবর সম্পূর্ণ নয়। তার মধ্যে ছাড়া-ছাড়া যা খবর পাওয়া যায় তাতে প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালীর সামগ্রিক ইতিহাস লেখা দুঃসাধ্য। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক খবরের সঙ্গে মিলিয়ে এইসব খবর যাচাই করে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এইসব নানা কারণে প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। কোনো কোনো যুগ সম্বন্ধে মোটামুটি খবর পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো সময়ের খবর একেবারেই নেই। সে যুগগুলি একেবারেই অন্ধকার।

কিন্তু এ সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাঙলার ইতিহাসের একটা মোটামুটি রূপ দেওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেটা শেষ কথা নয়। নতুন

গবেষণা, নতুন পুঁথিপত্র আবিষ্কার ও নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের মধ্যে দিয়ে সে ফাঁক পূর্ণ করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা ফাঁকই থেকে যেতে বাধ্য। বাঙলার ইতিহাসের এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও যে খবর পাওয়া যায় তা মোটামুটি ধারাবাহিক আর সেই খবরই এখানে অল্পের মধ্যে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙলাদেশে খুব প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন এখনো পাওয়া যায়নি। প্রস্তরযুগীয় যেসব হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে পশ্চিমের ও পুবের পার্বত্য অঞ্চলে সেগুলি খুব প্রাচীন যুগের নিদর্শন নয়। অন্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে এই যুগের মানুষেরা এইসব স্থানে বসতি করেছিল।

এমনকি বৈদিক যুগের উত্তরভারতীয়দের কাছে পর্যন্ত বাঙলাদেশের নাম ছিল অজ্ঞাত। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আর্যাবর্তের বাইরের অধিবাসীদের 'দস্যু' বলে উল্লেখ করা আছে আর সেই সঙ্গে নাম করা আছে 'পুণ্ড্র'দের। পুণ্ড্র একটা কোমের নাম। পুণ্ড্রদেশ বগুড়া জেলায় অবস্থিত ছিল। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'ও বাঙলাদেশের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে উল্লেখ নিন্দাসূচক।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নিশ্চিত উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় মহাকাব্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে। 'বোধায়ন ধর্মসূত্রে' পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ) ও বঙ্গের (মধ্য ও দক্ষিণ বাঙলা) উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগে বাঙলাদেশ আর নিন্দিত নয়, এখানকার অধিবাসীকেও অশুচি, নীচজাতীয় বলে খুব একটা উল্লেখও আর পাওয়া যায় না। বরং 'মহাভারতে' করতোয়া নদী ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমের পবিত্রতার কথা পাওয়া যায়। আর বাঙলার বিভিন্ন প্রাচীন জনপদবিভাগের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়।

জৈনদের গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' পশ্চিম বাঙলাকে পথহীন দেশ, যার অধিবাসীরা অশিষ্ট এবং শান্তিপ্রিয় শ্রমণদের আক্রমণ করে- বলে বলা আছে। একটি 'উপাঙ্গে' অবশ্য রাঢ়বাসী ও বঙ্গবাসীদের আর্য বলা হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগেই পাণিনি গৌড়ের নাম জানতেন।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যেসব উল্লেখের কথা বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশী লেখকদের লেখায় বাঙলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলেকজাণ্ডারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭) ঐতিহাসিকেরা গঙ্গরিদাই নামে এক পীপ্‌ল্ বা জনের উল্লেখ করেছেন। প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন বিদেশী ব্যক্তিদের মতে এই গঙ্গরিদাই জনের বসতি ছিল গঙ্গার নিম্নাংশ ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পারে। মৌর্যযুগেও পুণ্ড্র-বর্ধনের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং মহাস্থানে-পাওয়া একটি মৌর্য লিপিতে। প্রাচীন একজন গ্রীক নাবিকের লেখা পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঙ্গা ও তার তীরবর্তী গঙ্গা নামে একটি বাণিজ্যনগরের নাম পাওয়া যায়। ভূগোলবিদ টলেমির মতে তাম্রলিপ্তি ও গঙ্গা আলাদা। টলেমি গঙ্গানদীর পাঁচটি মুখের কথাও উল্লেখ করেছেন, এবং এগুলি প্রায় সবই চিহ্নিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। প্রাচীনকালে বাঙলাদেশ কখনও এক-নামে পরিচিত ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ছিল বিভিন্ন, যেমন বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়। মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমস্ত অঞ্চল বাঙলা বা বাঙ্গালা এই এক-নামে অভিহিত হয়।

জনপদবিভাগ ।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বাঙলাদেশ কখনো এক-নামে এক-দেশ হিসাবে উল্লেখিত হয় নি। তার কারণ, প্রাচীন যুগে বাঙলাদেশ বর্তমানের মতো একটি রাজ্য ছিল না—ছিল অনেকগুলি জনের বসতি ও জনপদে বিভক্ত। একেকটি কোমকে কেন্দ্র করে এগুলি গড়ে ওঠায় কোমের নাম অনুসারেই এদের নাম হয়। যেমন, পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদি। এদের আলাদা আলাদা রাষ্ট্র ছিল। মাঝে মাঝে তাদের প্রতাপ বেড়েছে, কমেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার সীমানাও পালটেছে। কিন্তু এদের আয়তন ঠিকমতো পাওয়া যায় না। নানা পুঁথিপত্র থেকে শুধু আঁচ পাওয়া যায়।

বঙ্গ ॥ বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। প্রাচীন দুটি বইতে 'বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গের প্রতিবেশী' বলা হয়েছে। মহাভারতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। পরবর্তী সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে ঠিক করা হয়েছে মোটামুটি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গই প্রাচীন বঙ্গ।

হরিকেল ॥ এটি ছিল প্রাচ্যদেশের পূর্ব সীমায়। এই জনপদটি বাখরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল জেলা) এলাকার সংলগ্ন ছিল।

সমতট ॥ গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বসীমা থেকে শুরু করে মেঘনার মোহানা পর্যন্ত ভূখণ্ডকে একসময়ে সমতট বলা হত।

পুণ্ড্র ॥ পুণ্ড্র জনপদ ছিল মুদ্‌গগিরি বা মুঙ্গেরের পূর্বদিকে ও কোশী নদীর তীরে। এটি ছিল অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম জনপদের ঠিক

গায়ে। খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান। পরে এটি পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়। পুণ্ড্র-বর্ধনভুক্তি অন্তত বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি গোটা উত্তরবঙ্গই বোধহয় তখন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাঢ় ॥ রাঢ় জনপদের উত্তরতম সীমা ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। তার নিচের সমস্ত অঞ্চলটিই এর মধ্যে ছিল। রাঢ়ের দুটি বিভাগ ছিল— বজ্রভূমি, অর্থাৎ হীরার দেশ, এবং সুহ্মভূমি। কোটীবর্ষ ছিল রাঢ়ের রাজধানী। পরে বজ্রভূমিকে উত্তর রাঢ় ও সুহ্মভূমিকে দক্ষিণ রাঢ় বলা হত।

তাম্রলিপ্তি ॥ মহাভারতের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধ পুঁথিতে বিরাট নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে বারবার তাম্রলিপ্তির নাম পাওয়া যায়। গ্রীক পেরিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমির ভূগোলে, ফাহিয়ান, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতির বিবরণে তাম্রলিপ্তির বর্ণনা আছে। তাম্রলিপ্তি ছিল সমুদ্র-যাত্রার প্রধান বন্দর, এখনকার তমলুক অঞ্চল নিয়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পর থেকে তাম্রলিপ্তি বন্দরের পতন ঘটে।

গৌড় ॥ মুরশিদাবাদ ও বীরভূমই গৌড়ের আদি কেন্দ্র, পরে মালদহ ও সম্ভবত বর্ধমান জেলাও এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই কটি জেলা নিয়েই প্রাচীন গৌড়। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের আমলে তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। এটি মুরশিদাবাদের রাঙামাটি অঞ্চলের বর্তমান কানসোনা গ্রাম। আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলতে যা বুঝি, অর্থাৎ মালদহ, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কিছু অংশ— তাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ।

বঙ্গাল ॥ প্রাচীনকালে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক জনপদ ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল এই বঙ্গাল দেশ, এবং দুই দেশের মাঝখানে সীমা ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। তখন বঙ্গাল বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত অঞ্চলকেই বোঝাত।

বাঙলা ॥ প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলাদেশ এই সব জনপদে বিভক্ত ছিল। সপ্তম শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা হলেন, তখন পশ্চিম বঙ্গ সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। শশাঙ্কের পর বাঙলাদেশে তিনটি জনপদ প্রধান হয়ে ওঠে—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। অন্যান্য অনেক জনপদ থাকলেও সেগুলো প্রায় বিলীন হয়ে যায় এই তিনটির মধ্যে। শশাঙ্ক ও তারপর পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের অধিপতি হয়েও রাঢ়েশ্বর নাম না নিয়ে নিজেদের পরিচয় দিতেন গৌড়াধিপ বা গৌড়েশ্বর বলে। শশাঙ্কের সময়েই একটিমাত্র নামে প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন জনপদকে এক-রাজ্যে বাঁধার সূচনা দেখা দিয়েছিল। পাল ও সেন রাজাদের আমলে সে স্বপ্ন সফল হয়। অবশ্য বঙ্গ তখনও স্বতন্ত্র জনপদ হিসেবে নিজের সত্তা বজায় রেখেছে। এক গৌড় নাম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকলেও তার জনপদসত্তা নেই। পরবর্তী কালেও গৌড় নামে বাঙলার কিছুটা অংশের জনপদসত্তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তখন বাঙলার বাইরে বাঙালীমাত্রেই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় নামে পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু শশাঙ্ক এবং পাল ও সেন রাজাদের চেষ্টা সফল হয় নি। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অবজ্ঞাত 'বঙ্গ' নামই তুর্ক-

বিজয়ীরা গ্রহণ করে, দেশটাকে নাম দেয় 'বঙ্গালা'। সেই নামেই তাই পাঠান আমলে বাঙলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল। আকবরের আমলে গোটা বাঙলাদেশ সুবা বাঙলা হিসাবে পরিচিত হল। অবশ্য সুবা বাঙলার আয়তন আজকের বাঙলার চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো ছিল।

প্রাগার্য বাঙালী

আগেই বলা হয়েছে, বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩২৬ সাল থেকেই মোটামুটি সনতারিখ-মেলানো খবর আমরা জানতে পারি।

বাঙলাদেশে সেই সময়ের বহু আগে থেকেই নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো রকমের সংঘবদ্ধ সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একেবারেই নেই বলা চলে। যেটুকু জানা যায় তা হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকস্মিক উল্লেখ থেকে। বৈদিক সাহিত্যে বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে বাঙলাদেশের জনগণ বৈদিক-সাহিত্য-রচয়িতা আর্যদের থেকে জাতি ও সংস্কৃতিতে ছিলেন আলাদা। আরও বোঝা যায় যে ঋগ্‌বেদের যুগে বাঙলা-দেশ আর্যদের কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিল। ঋগ্‌বেদের পরবর্তী যুগে আস্তে আস্তে বাঙলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে থাকে। কিন্তু যোগাযোগ বাড়লেও তখনো, এমনকি তারপরে বহুদিন, বাঙলাদেশ কার্যত বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চৌহদ্দির বাইরে ছিল।

বাঙলার অধিবাসীদের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোঁড়া আর্যদের ধারণা কী ছিল সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনী থেকে। বিশ্বামিত্র ঋষি একটি ব্রাহ্মণ বালককে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেন। ছেলেটি ইতিমধ্যে ক্রোধশান্তির জন্য এক দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশটি ছেলে এতে আপত্তি জানালে বিশ্বামিত্র তাদের শাপ দেন যে তাদের সন্ততিরা পৃথিবীর সীমার উত্তরাধিকারী হবে। এরাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব নামে পরিচিত হয়। এরা আর্যাবর্তের বাইরে বিপুল সংখ্যায় বাস করতে থাকে ও দস্যু বা বিদেশীয় বর্বর নামে অভিহিত হয়। মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বেও এই কাহিনীর রেশ পাওয়া যায়।

মহাভারতের আদি পর্বে এবং মৎস্য ও বায়ুপুরাণে কিন্তু ভিন্ন ধরনের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। এতে পুণ্ড্র জন এবং এদের সঙ্গে সম্পর্কিত বঙ্গ ও সুহ্মদের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। একজন বৃদ্ধ অন্ধ মুনি একটি ভেলায় করে গঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। বিভিন্ন দেশ পার হয়ে তিনি শেষে বলি নামে এক নিঃসন্তান রাজার নিকট পৌঁছন। রাজা তাঁকে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। মুনি রাজী হন এবং রানী যথাসময়ে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেন। তারা হল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এদের নামে পাঁচটি দেশের নাম হয়। এই দেশগুলি বর্তমানের বাঙলা ও উড়িষ্যা রাজ্য ও বিহারের ভাগলপুর জেলা। এই কাহিনী-গুলিতে বাঙলার অনার্য অধিবাসীদের ধীরে ধীরে আর্যসমাজভুক্তি সূচিত হয়।

উত্তর ভারত থেকে ঋষিদের রক্ত বাঙালীর শরীরে মিশলেও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীরা যে আর্যদের কাছে হেয় ছিল পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য থেকে তা বোঝা যায়। বাঙলাদেশের লোকেরা পরেও দস্যু বলে অভিহিত হয়েছে। মহাভারতে সমুদ্রতটবাসীদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। ভাগবতপুরাণে সুহ্মদের পাপী কোম হিসাবে কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, আভীর, পুক্কস যবন, খস প্রভৃতি অনার্য কোমদের

সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বোধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ ও পুণ্ড্রে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

জৈনরাও বাঙালীর অ-সভ্য চরিত্রের কথা বলেছেন। আচারাঙ্গ সূত্রে বলা হয়েছে যে মহাবীর লাঢ় (রাঢ়), বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমির পথহীন দেশে ভ্রমণকালে সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তারা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। প্রায় কেউই কুকুরগুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করে নি। শ্রমণদের দিকে ঢিল ছুঁড়ে তারা 'চু-চু', 'ছু-ছু' করে কুকুরদের ডাকত তাদের কামড়াবার জন্য। অন্যান্য অনেক ভিক্ষুকে বজ্রভূমিতে কুখাদ্য খেয়ে থাকতে হত। জৈন লেখক দুঃখ করে বলেছেন যে লাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলায় ভ্রমণ দুঃসাধ্য।

বাঙলার জনবৈচিত্র্য

বাঙলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে বিভিন্ন অনার্য নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ শুধু সাহিত্যেই নেই, ভাষায়ও আছে, আর আছে সেই নরগোষ্ঠীর বংশধর বাঙালীর দেহের গঠনের মধ্যেও। এই নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত বিচার থেকে আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছি কোন কোন জন বাঙলাদেশে এসে তাদের বসতির ছাপ রেখে গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন জনের মিলনের ফলেই বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি। এর ফলে আজও আমরা দশজন বাঙালীকে পাশাপাশি দাঁড় করালে দেখব তাদের মধ্যে গঠনগত অমিল কতখানি। কারো মাথার গড়ন লম্বাটে, কারো গোল, কারো গোল আর লম্বার মাঝামাঝি। কারো নাক খাঁদা-চ্যাপটা, কারো উঁচু, কারো লম্বা। দেহের দৈর্ঘ্যেও একজনের সঙ্গে আরেক-জনের কমবেশি তফাত।

একের পর এক ঢেউয়ের মতো বিভিন্ন জন এসেছে এদেশে আর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকর বাঙালী জাতির জন্ম দিয়েছে। এদের মধ্যে সবার আগে এসেছে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জন। এই নেগ্রিটোরা বাঙলার তথা ভারতের আদিম বাসিন্দা। ভারতের নানা জায়গায় তারা ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘর্ষের আবর্তে তারা টিকে থাকতে পারে নি, নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু আসামের অঙ্গমি নাগা, দক্ষিণ ভারতের

পেরাম্বিকুলম ও আন্নামালাই পাহাড়ের পুলায়ান ও কাদারদের মধ্যে, বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের রাজমহলের বাগ্‌দী ও সুন্দরবনের মৎস্য-শিকারী নিম্নবর্ণের মধ্যে, ময়মনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনো কোনো জায়গায় মানুষের চেহারায় আজও সেই বিলুপ্ত নরগোষ্ঠীর রক্তের ও দেহবৈশিষ্ট্যের চিহ্ন কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায়।

আদি-অস্ট্রেলীয়—নিম্নবর্ণের বাঙালী এবং বাঙলার আদিবাসীদের ভিতরে আদি-অস্ট্রেলীয় জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই জনের দেহবৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি ভারতের, বিশেষ করে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান। 'বর্তমান বাঙলা-দেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশ-ফোড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতি লোকদেরও সেই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। আদি-অস্ট্রেলীয়দের রক্তের সঙ্গে আগেকার নিগ্রোবটুদের রক্ত কোথাও কোথাও কমবেশি মিলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।'

এর পর ভারতের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে আরও তিনটি জন আসে একের পর এক। তারা হল দীর্ঘমুণ্ড জন, গোলমুণ্ড বা অ্যালপাইন নরগোষ্ঠী ও আদি-নর্ডিক জন। এই তিনটি জন প্রধানত ভারতের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করে। বাঙলাদেশের নরগোষ্ঠীতে এদের দান খুবই সামান্য।

এদের পরে আরেকটি জন আমাদের দেশে আসে। তা হল মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী। ভারতের জনপ্রবাহে এদের প্রভাব কোথাও খুব বেশী করে লাগে নি। ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ধরে মঙ্গোলীয় জনের একটি দীর্ঘমুণ্ড ধারা বাঙলাদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু রংপুর,

কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মধ্যেই তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ থেকেছে। ব্রহ্মদেশীয় গোলমুণ্ডদের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাকমা আর টিপরাইদের এবং আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগদের। বাঙলাদেশের আর কোথাও এদের প্রভাব বিশেষ পাওয়া যায় না।

বাঙলাদেশে এই বিচিত্র রক্তধারা খুব গভীর ও ব্যাপক ভাবে মিশে গেছে। নরতত্ত্বের দিক থেকে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ একই গোষ্ঠীর লোক। বাঙালী কায়স্থরা আবার বাঙালী সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বাঙলাদেশের সমস্ত বর্ণের সঙ্গে বাঙালী কায়স্থদের আত্মীয়তাই সবচেয়ে বেশী।

বাঙলাদেশের বুকে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দিয়ে আজও সমানে চলেছে। সে ধারা এখনো থামে নি। আজও নানান জনের ধারা মিশে একাকার হয়ে বিচিত্র এই বাঙালীর সৃষ্টি করছে।

বাঙালীর এই অনার্য ভিত্তির পরিচয় নানা ভাবে, নানা রূপে তার জীবনে, সভ্যতায়, ধর্মকর্মে, ধ্যানধারণায় তার ছাপ রেখে গেছে। সে বিচার প্রধানত নৃতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের হলেও এখানে তার সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া হল।

বাঙলাদেশের কুড়ি হিসেবে গোনার ও চার কুড়িতে বা আশিটায় এক পণ গোনার রীতি আমরা পেয়েছি অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীদের কাছ থেকে। 'পণ', 'গণ্ডা', 'গুঁড়ি', 'গুঁটি'—প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষার দান।

এই অস্ট্রিক ভাষা এক সময়ে ভারতের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরাট অঞ্চল জুড়ে চলিত ছিল। এই ভাষাভাষীরা যে সবাই একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নয়। কিন্তু ঐ ভূখণ্ডের আদিম স্তরে সর্বত্রই এই ভাষার চল ছিল। নানা জন-বিবর্তনের মধ্য থেকেও সেই ভাষাপ্রবাহ আজও চলে আসছে। একসময়ে এই ভাষা মধ্য-ভারত থেকে শুরু করে সাঁওতাল ভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে দ্রবিড় ও আর্যভাষার প্রসারের ফলে এর আধিপত্য সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিতে এর সঙ্গে যোগাযোগের কিছু না কিছু নিদর্শন থেকে যায়। বাঙলাদেশের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু শব্দই এই অস্ট্রিক ভাষার দান। যেমন—খাঁ খাঁ, বাখারি, কানি, ঠেঙ্গ, ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, কলি (চুন), পেট, ঝাড়, ডোম,

চোঙ, চোঙা, বোয়াল, করাত, দা, লাউ, লেবু, কলা, কামরাঙা, ডুমুর প্রভৃতি। পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্তি—দামলিপ্তি এবং গঙ্গা ও বঙ্গ নাম ছুটিও বোধহয় অস্ট্রিক ভাষার দান। দ্রবিড়ভাষা থেকে বাঙলার অনেক জায়গার নাম বা নামের উপান্ত এসেছে। যেমন উপান্ত 'ড়া' দিয়ে (বগুড়া, হাবড়া, বাঁকুড়া), 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), 'জুলি' (নয়নজুলি), 'জোল' (নাড়াজোল), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ।

'ভেতো বাঙালী বলে বাঙালীদের একটা ছুর্নাম আছে। এই ছুর্নামের পেছনে রয়েছে এক গৌরবময় সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। সে সভ্যতা হল কৃষি-সভ্যতা। অস্ট্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় লোকেরাই এদেশে প্রথম চাষ-আবাদের প্রচলন করে। কাঠের লাঙলে তারা প্রধানত ধানের চাষ করত। ধানই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। আর 'লাঙল' শব্দটাও তাদেরই ভাষা থেকে নেওয়া। এ থেকে বোঝা যায়, আর্যভাষীরা চাষের কাজ জানত না।' 'নদনদী আর বৃষ্টির জলে ধানের ফসল বেশি হয় বলেই বাঙলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতলভূমিতে ধানের চাষ এত ব্যাপক।'

'উত্তর ভারতের লোকেদের যেমন রুটি, বাঙলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশের লোকেদের তেমনি ভাতই প্রধান খাদ্য। এই প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনাও লক্ষণীয়। 'বাঙলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে লোকে সাধারণত রান্নার কাজে সরষে, নারকেল, অথবা তিল তেল ব্যবহার করে। সেলাই-না-করা ধুতি-চাদর, উড়ুনি এবং পেছন-খোলা চটি এইসব অঞ্চলের লোকে

পরে থাকে।' কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা ঘি, 'সেলাই-করা জামা-কাপড়, গোড়ালি-বাঁধা চটি ব্যবহার করে। এ থেকে আমরা জনপার্থক্যের ইঙ্গিতও পাই।'

'ধান ছাড়া অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারকেল, জাম্বুরা (বাতাবি লেবু), কামরাঙা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি ইত্যাদিরও চাষ করত। এই নামগুলোও মূলত অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। চাষবাস জানলেও গো-পালন এরা জানত কিনা সন্দেহ।'

'তুলোর কাপড়ের ব্যবহার অস্ট্রিকভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটি মূলত অস্ট্রিক। পট (পট্ট বা পাট), কর্পট (পট্টবস্ত্র) এ-দুটি শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। 'কম্বল' কথাটা মূলত অস্ট্রিক।'

'অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কতকগুলি অরণ্যচারী শাখা—যেমন নিষাদ, ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি পশুশিকারজীবী ছিল। বাণ, ধনু, পিনাক, দা ও করাত—এ সমস্তই মূলত অস্ট্রিক শব্দ। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার (হাতি অর্থে), কপোত (শুধু পায়রা নয়, যে কোনো পাখি) ইত্যাদি শব্দ মূলত অস্ট্রিক।'

'গুঁড়িকাঠের তৈরী লম্বা ডোঙা (অস্ট্রিক শব্দ), ডিঙি আর ভেলায় চড়ে প্রাচীন অস্ট্রিকভাষী লোকেরা নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করত এবং এইভাবেই তারা একটা বিরাট সামুদ্রিক বাণিজ্যও গড়ে তুলেছিল।'

'অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রা যে বাস্তব সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা একান্তভাবেই গ্রামকেন্দ্রিক। চাষবাস জানত বলে তাদের খাদ্যের

অভাব ছিল না, লোকবলও কম ছিল না। মুণ্ডাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে গ্রামসঙ্ঘের মতো সমাজবন্ধন এখনও দেখা যায়। ভারতে পঞ্চায়েত প্রথার প্রচলন সম্ভবত তারাই করে।'

দীর্ঘমুণ্ড দ্রবিড়-ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষে নাগর সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে। আর্যভাষায় উর, পুর, কুট প্রভৃতি নগরসূচক শব্দগুলি প্রায় সবই দ্রবিড়ভাষা থেকে এসেছে। এই দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর লোকেরা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার জানত এবং তারা খুব ভালো কারিগর ছিল। দ্রবিড়ভাষার 'কর্মার' শব্দ থেকে বাঙলায় 'কামার' শব্দ এসেছে। মাটির পাত্র যে তৈরি করত তার নাম 'কুলাল'। চারুশিল্পের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের প্রমাণ—'রূপ' ও 'কলা' দুটিই দ্রবিড় শব্দ। বানর, গণ্ডার ও ময়ূরের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের প্রমাণ 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' (জন্তু অর্থে) ও 'ময়ূর' প্রভৃতি দ্রবিড় শব্দ থেকে গৃহীত। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময়দানবের কাহিনী, মোহেন-জো-দাড়োর নগর-বিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ এই দ্রবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীর নগরনির্ভর সভ্যতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বাঙলাদেশে সরাসরি দ্রবিড়ভাষীদের মারফত তাদের ভাষা ও সভ্যতার প্রভাব যতটা না এসেছে, তার চেয়েও বেশি এসেছে আর্যভাষীদের মারফত। আর্যভাষীরা দ্রবিড়ভাষীদের ভাষা ও বাস্তব সভ্যতা যতটা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকখানি তারা বাঙলায় সঞ্চারিত করেছিল। আজ আমরা তাকে আর্যভাষীদের দান বলেই ভুল করে থাকি। তবু মনে হয়, বাঙালীদের টাটকা ও শুঁটকি মাছে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য

কারুশিল্পে দক্ষতা, চারুশিল্পের অনেক জ্যামিতিক নক্‌শা ও পরিকল্পনা, নগরসভ্যতার যতটুকু সে পেয়েছে তার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসসামগ্রীর অনেক কিছু, জলসেচনে উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি সব কিছুই দ্রবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীপ্রবাহেরই ফল।

অবৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতার রূপ কী ছিল আজ তা অনুমান করার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বৈদিক আর্যভাষীরা পশুপালকের যাযাবর জীবন যাপন করত আর সে সভ্যতা ছিল আদিম স্তরের। 'যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে এদেশে এসে স্থিতি লাভ করবার পর পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রবিড়ভাষীদের সংস্পর্শে এসে তারা প্রথমে কৃষি বা গ্রাম্যসভ্যতা ও পরে নগরসভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হল। ক্রমে এই দুই সভ্যতাকেই নিজের করে নিয়ে তারা এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলল। আর্যভাষা হল তার বাহন।'

প্রাগার্য বাঙালীর ধ্যানধারণা

আর্যভাষীরা যে অন্-আর্য ভিত্তির উপর নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলল তা কিন্তু একেবারে বিলোপ পেল না। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের বহু রীতি-নীতির মধ্যে, তার লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাগার্য সেই সব ধারণা ও ক্রিয়াকর্ম আপন সত্তা বজায় রেখেছে। আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই এইসব জিনিস দেখতে পারি।

হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদের উৎপত্তির মূল কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষীদের ধারণা। তারা মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করত। কেউ মরে গেলে তার আত্মা কোনো গাছ, পাহাড়, জন্তু বা পাখি বা অন্য কোনো জীবকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। এরা মৃতদেহ কাপড় বা গাছের ছালে জড়িয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিত অথবা মাটির নিচে কবর দিয়ে তার উপর বড় বড় পাথর সোজা করে পুঁতে দিত। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে মাঝে মাঝে খাবার জিনিস রেখে দিত। এইসব বিশ্বাস ও প্রথাই হিন্দুধর্মে গৃহীত হয়ে শ্রাদ্ধাদি কাজে মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান প্রভৃতি ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের ভিতরে লিঙ্গ-পূজাও প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ‘লিঙ্গ’ শব্দটি তো অস্ট্রিক ভাষারই দান।

অস্ট্রিকভাষীরা ‘বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, ফলমূল, ফুল, কোনো বিশেষ জায়গা, বিশেষ বিশেষ পত্র, পক্ষী ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার পুজো করত। বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে গাছ-

পুজো তো এখনও চলে। পাথর ও পাহাড় পুজোও একেবারে অজ্ঞাত নয়। আদিম অস্ট্রিকভাষী লোকদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই আজও আমাদের মধ্যে নানাভাবে টিকে আছে। যেমন, বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-মূল সম্বন্ধে বিধিনিষেধ, বিশেষ বিশেষ ফলমূল পূজার্চনায় উৎসর্গ করা; নবান্ন উৎসব, নানারকমের মেয়েদের' ব্রতের প্রায় সবই, ইত্যাদি। আমাদের দেশের ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, সিঁদুর. কলাগাছ প্রভৃতি বেশ বড়ো একটা জায়গা জুড়ে আছে। আসলে এসবই সেই প্রাচীন কৃষি-সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করছে। বাঙলাদেশের হোলি বা হোলাক উৎসব ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চড়ক-ধম প্রভৃতি পূজা বিশ্লেষণ করলে এমন অনেক উপাদান পাওয়া যায় যা মূলত অনার্য।

দ্রবিড়ভাষী লোকেরা ভাবুক ও অধ্যাত্মরহস্যসম্পন্ন ছিল। এদের মধ্যেকার ছুঁৎমার্গ আর্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। যোগধর্ম ও সাধনপদ্ধতি এদের কারো কারো মধ্যে প্রচলিত ছিল।

হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, অনেক দেবদেবী—বিশেষ করে স্ত্রীদেবতাদের অধিকাংশই—যেমন শিব, দুর্গা, শিবলিঙ্গ, কালী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতি যে জায়গা জুড়ে আছে, তার মূলে রয়েছে প্রাগার্য দ্রবিড় প্রভাব। যাগযজ্ঞও দ্রবিড়ভাষীদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত ছিল। 'অরণি' ও 'ব্রীহি'—শব্দ দুটির সম্পর্ক মূলত দ্রবিড়ভাষার সঙ্গে। বাঙলার ক্রিয়াকর্মের আচারে স্ত্রীপ্রাধান্য, এত বিভিন্ন দেবীপূজা—এ সবই আর্যপূর্ব নরগোষ্ঠীর দান।

আর্যভাষীদের ভারতে আসার পরে শতাব্দীর বিরোধ ও মিলনের

ভেতর দিয়ে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতে গড়ে উঠতে থাকে। বাঙলাদেশে আর্যীকরণের শুরু অনেক দেরিতে হলেও তা এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি। আর্যপূর্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির ও বাঙালী সংস্কৃতির উদ্‌ভব ও বিকাশ। এর মধ্যে কোনো একটি ধারাই প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। বর্তমান বাঙালী এদের দুয়ের মিলনের ফল।

বাঙলাদেশের আর্যীকরণের সূত্রপাত ঠিক কখন বলা যায় না। তবে মোটামুটি খ্রীষ্টজন্মের হাজার বছর আগে থেকে তা শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মহাভারতের সভাপর্বে বঙ্গ ও পুণ্ড্র জনদের সৎকুলজাত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সময়ে করতোয়া নদী ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম পুণ্যতীর্থ বলে পরিগণিত হয়েছে। এ-ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙলাদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ, ভীম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। পুণ্ড্র-রাজ বাসুদেব বঙ্গ-পুণ্ড্র ও কিরাত জনপদকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন ও মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব অবশ্য কৃষ্ণের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ভীম বাঙলার সমস্ত রাজন্যকুলকে পরাজিত করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন পৌণ্ড্ররাজ এবং সমুদ্রসেন ও তৎপুত্র চন্দ্রসেন। অনেক দিক থেকে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব এক বিশিষ্ট চরিত্র এবং তাঁকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর গৌড়ীয় রাজ্যজয়কারীদের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

মহাকাব্যের কাহিনীগুলি বাঙালীর সামরিক শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেয়। তেমনি সিংহলের পালি ইতিহাসগুলিও আরেকদিকে বাঙালীর কীর্তির পরিচয় বহন করছে। পালি পুরাণমতে বাঙলার রাঢ়দেশের

রাজপুত্র বিজয়সিংহ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে গুজরাট ঘুরে অবশেষে সিংহলে উপনীত হন (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দ)।[১] এই কাহিনীর সত্যতা যাচাই করা মুশকিল। বাঙলা ও সিংহলের মধ্যেকার প্রাচীন রাজনৈতিক সম্পর্কের কোনো সত্য ঘটনার উপরেও এই কিংবদন্তী গড়ে উঠতে পারে।

এ-পর্যন্ত যা আমরা পেলাম তা ইতিহাসের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর। তবুও এটুকু বোঝা যায় যে বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অনার্য ও আর্যভাষীদের আগমন শুরু খ্রীষ্টজন্মের হাজার বছর আগে থেকে। ঐতিহাসিক কালের আগেও বাঙলাদেশে স্থায়ী রাষ্ট্র ছিল। দেশ অনেকগুলি ছোটোবড়ো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আর বাঙলার রাজাদের সঙ্গে বাঙলার পশ্চিম প্রান্তের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আর শৌর্যবীর্যের কথা উঠলেও বলা যায়—আদি বাঙালী যুদ্ধ জানত, তার সাহসের অভাব ছিল না।

গুপ্তশাসন ও শশাঙ্ক ॥ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় বাঙলাদেশে যে শক্তিশালী রাজ্য ছিল, সে খবর জানা যায় গ্রীক ও লাতিন লেখকদের লেখা থেকে। তাঁরা প্রাসিয়ায় বা প্রাচ্যরাষ্ট্র ও গঙ্গরিদই বা গঙ্গারাষ্ট্র নামে দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের নাম করেন। এ-দুটি রাজ্য ছিল মগধ ও বঙ্গ। সে সময়ে এ দুটি মিলে এক রাজার অধীনে আসে এবং এক যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা হয়। রাজার নাম ছিল ঔগ্রসৈন্য। তাঁর পিতার নাম উগ্রসেন বা মহাপদ্মনন্দ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাঙলাদেশের রাজা বা রাজবংশ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। সমুদ্রগুপ্তের আমলে এক সমতট ছাড়া সমগ্র বাঙলাদেশেই গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতটের রাজা গুপ্তদের করদ রাজা ছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন বাঙলাদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা একটা লিপিতে পুষ্করণের অধিপতি সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার নাম আছে। বর্মাদের রাজত্ব সম্ভবত বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত এই চন্দ্রবর্মাকেই পরাজিত করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙলা জয় করেন। উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এর গুরুত্বের জন্য গুপ্তসম্রাট স্বয়ং এর শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন।

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ॥ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে, বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ হুনদের আক্রমণের ফলে। এই সময়ে বাঙলাদেশে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্ত-অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। এই রাজ্য বর্ধমান থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবত এঁরা খ্রীষ্টীয় ৫২৫ থেকে ৫৭৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, এমনকি এঁদের পরস্পরের সম্বন্ধনির্ণয়ও অসম্ভব। তবু নানাকারণে মনে হয় বঙ্গরাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল। ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে গৌড় রাজ্যের অভ্যুদয় ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজের আক্রমণে বঙ্গরাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে।

গৌড় ॥ এই সময়ে উত্তরবঙ্গের নাম হয় গৌড় এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলেও গৌড় মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌখরিরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে ও তিব্বতী আক্রমণে গুপ্তরা একেবার পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন ও সেই সুযোগে গৌড়ে শ্রীমহাসামন্ত **শশাঙ্ক** স্বাধীন রাজা হিসাবে দেখা দেন।

শশাঙ্কর প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি বাঙলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি। বাঙলার ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সম্ভবত তিনি প্রথমে গুপ্তসম্রাটদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় বা ঐ সময়ের কাছা-কাছি তিনি গৌড়ে স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের নিকটবর্তী রাঙামাটি গ্রাম) তাঁর রাজধানী ছিল। কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ

ও তাম্রলিপ্তি—পাঁচটির মধ্যে তৎকালীন বাঙলার এই চারটি জনপদই শশাঙ্কর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। সমতট সম্ভবত তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও তিনি জয় করেন। শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন। কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ —উত্তর-ভারতের এই তিনটি প্রবল রাজ্যের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যের সাঙ্গ সংগ্রাম করেন ও স্বাধীন রাজা হিসাবে সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী হন। হর্ষবর্ধনের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ছিলেন একমাত্র শশাঙ্কই। উত্তর ভারতে পাল আমলে বাঙলার আধিপত্য নিয়ে যে সংগ্রাম হয়েছিল তার সূচনা শশাঙ্কই করে যান। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশকে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছিলেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি গৌড়দেশ, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদ-এর অধিপতি ছিলেন। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখেছেন। অথচ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারি যে শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ও তাঁর রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার হয়েছে।

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে কলহ বাধল। হর্ষবর্ধন কোঙ্গোদ, কজঙ্গল ও মগধ জয় করে নিলেন এবং ভাস্করবর্মা নিলেন পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি শশাঙ্কর সার্বভৌম গৌড়রাজ্য ভেঙে গেল।

'শশাঙ্কর আমলে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়েছে, নতুন নতুন সামাজিক দায় ও কর্তব্য এসে

হাজির হয়েছে।' ভুক্তি শাসকের ক্ষমতা বেড়েছে, রাজকর্মচারীদের সংখ্যাধিক্যও এযুগেই শুরু হয়েছে। আগে যা ছিল পল্লীসমাজ বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের আওতার মধ্যে, আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের হাতও সেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। এই আমলেই বাঙলাদেশে পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। অনেক সামন্তই প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজার মতোই রাজত্ব করতেন। কাগজেকলমে বা মুখে অবশ্য সেকথা জাহির করতেন না। কিন্তু মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুর্বল হলে বা কোনোরকম সুযোগ পেলেই তাঁরা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতেন। কোনো কোনো সামন্ত-মহাসামন্ত সম্রাটের উচ্চ রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার একদল সামন্ত থাকত। সামন্তরা যুদ্ধের সময় মহারাজকে সৈন্য জোগাতেন এবং নিজেরাও যুদ্ধে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।

'এই যুগেই বাঙলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যসমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ছিল বলেই রাষ্ট্রে বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের রীতিমতো প্রাধান্য ছিল।...এই যুগে বাঙলার সামাজিক ধনদৌলত ছিল এদেরই হাতে এবং সেই ধনদৌলতের জোরেই রাষ্ট্র ফেঁপে উঠেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে কৃষিসমাজের কোনো স্থান ছিল না বললেই চলে।...নগর ছিল ব্যবসাবাণিজ্য-শিল্পের কেন্দ্র। নাগরিকেরা বিলাসব্যসনে সময় কাটাতেন।'

শশাঙ্কর সময়েও বঙ্গ, সমতট, গৌড় প্রত্যেক রাষ্ট্রেও সুবর্ণমুদ্রার চল ছিল। কিন্তু পরে খাঁটি মুদ্রার বদলে নকল মুদ্রার চল হতে শুরু করে। 'রুপোর মুদ্রা একেবারে নেই-ই। ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। মহত্তর--গ্রামিক-কুটুম্ব ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি বাড়ছে। এই যুগেই জমির চাহিদা বেড়ে গিয়ে সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর হয়ে পড়ছে।'

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্মা ছিলেন শৈব; রাজবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গ রাজারাই বৌদ্ধ। বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই প্রভাব-প্রতিপত্তির শুরু হয় গুপ্ত আমলে। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্ম রাজানুকূল্যে সারা ভারতে বিস্তৃত হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধতা না থাকলেও রাজকীয় প্রশ্রয় পেয়েছে হিন্দুধর্মই। ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যসমাজ রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে এবং তাঁরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম নিয়ন্তা। এঁদের অবলম্বন করে বাঙলাদেশে আর্যভাষা, আর্যধর্ম ও আর্যসংস্কৃতির স্রোত বাঙলাদেশকে প্লাবিত করে দিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকাহিনী ইত্যাদি এসে বাঙলার প্রাচীনতর ধর্ম-সংস্কৃতি-লোককথাকে এক পাশে অবজ্ঞায় ঠেলে ফেল দিল। 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হল আর্যভাষা, ধর্ম হল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম।' আর্য আদর্শ অনুসারে সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে উঠল।

শশাঙ্কর আমলে এই অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। জনসাধারণের বেশ বড়ো একটা অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করলেও সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ছাড়া তা রাজকীয় অনুগ্রহ পায় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিরই সাধারণভাবে জয়-জয়াকার।

বঙ্গ-গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য, মাৎস্যন্যায়॥ শশাঙ্কর মৃত্যুর পরেই ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ বাঙলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি—এই পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। উৎকল ও কোঙ্গোদও তখন স্বাধীন। শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌড়রাজ্য তাঁর দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর

দখলে যায়। হর্ষের মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রীঃ) জয়নাগ নামে এক রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

এই যুগে অনেক বহিঃশত্রু বাঙলাদেশ আক্রমণ করে। এই সময় থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায়ই বাঙলা তিব্বতী অভিযানে ব্যতিব্যস্ত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈল বংশীয় একজন রাজা পুণ্ড্রদেশ জয় করেন। এর অল্পকিছুদিন পরেই কনৌজরাজ যশোবর্মা গৌড় জয় করেন। এর পরেই কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে যশোবর্মা পরাজিত হন। গৌড় অন্তত কিছুদিনের জন্যও ললিতাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করে।

এইসব বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই করা বেশ কঠিন হলেও, বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে মনে হয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙলাদেশে একচ্ছত্র অধিপতি কেউ ছিলেন না। রাষ্ট্রের কোনো সামগ্রিক ঐক্য ছিল না। ছোট ছোট সামন্তরাজারই নিজেদের এলাকায় একচ্ছত্র হয়ে উঠেছিলেন আর এই সমৃদ্ধ অথচ বহুবিভক্ত দেশের উপর অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল।

বঙ্গ-রাজ্য শশাঙ্কর অধীন ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই এখানে সমতট নামীয় স্বাধীন রাজ্য ছিল তা হিউয়েন সাঙ লিখেছেন। সমতটের রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয় ও নালন্দার তৎকালীন অধ্যক্ষ শীলভদ্র ছিলেন এই রাজবংশের লোক।

এরপর খড়্গবংশের অভ্যুদয়। খড়্গোদ্যম, তৎপুত্র জাতখড়্গ ও তৎপুত্র দেবখড়্গ—এই তিনজন রাজা সম্ভবত সপ্তম শতকের শেষার্ধে রাজত্ব করেন। দেবখড়্গের পরে রাজা হন তৎপুত্র রাজরাজ বা

রাজরাজভট। এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ আর রাজ্য ছিল দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত।

যশোবর্মার বঙ্গজয়কালে বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চলে রাত উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করতেন। এই বংশীয় জীবধারণ রাত ও তৎপুত্র শ্রীধারণ রাত, এই দুই রাজার সমতটেশ্বর উপাধি ছিল।

এই সময়েই ত্রিপুরা অঞ্চলে আরেকটি সামন্ত রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। শিবনাথ, শ্রীনাথ, ভবনাথ, লোকনাথ—সকলেই এই বংশের সামন্ত।

নামে সামন্ত হলেও এঁরা কার্যত স্বাধীন রাজার মতোই ব্যবহার করতেন। অষ্টম শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও তার ভিত আলগা হয়ে পড়েছিল।

খড়্গবংশের পতনের পর বঙ্গরাজ্য চন্দ্রবংশীয় রাজাদের হাতে আসে। গোবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা।

ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সারা বাঙলাদেশ জুড়ে দারুণ নৈরাজ্য নেমে এল। গৌড়-বঙ্গ-সমতটে তখন কোনো রাজার আধিপত্য নেই। রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন ; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ—সবাই নিজের ঘরে রাজা। আজ একজন রাজা হয়, কাল তার মাথা কাটা যায়। এই নৈরাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে মাৎস্যন্যায়। একশো বছর ধরে এই রকম অরাজকতা। অবশেষে অবস্থা যখন চরমে উঠল তখন বাঙলার রাষ্ট্রনায়কেরা একজোট হয়ে নিজেদেরই একজন রাজা করলেন ও তাঁর সর্বময় প্রভুত্ব মেনে নিলেন। এই নির্বাচিত রাজার নাম গোপালদেব।

'মাৎস্যন্যায়ের এই একশো বছরে শান্তিশৃঙ্খলার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেজায় কাহিল হয়ে পড়ল। বাঙলাদেশের

মুদ্রাজগৎ থেকে সুবর্ণমুদ্রা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্যসূর্য চিরতরে অস্তমিত হল।…ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে এই একশো বছরের দুর্দিনের সুযোগে বাঙলাদেশে বড় রকমের রূপান্তর ঘটছিল বলে মনে হয়।' যে সংস্কৃত বাঙালী পণ্ডিতদের কোনোরকমে ভাবপ্রকাশের উপায়মাত্র ছিল, তা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি অপূর্ব ছন্দলালিত্যময় ভাবপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। 'পালবংশ প্রধানত বৌদ্ধ বলে বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অষ্টম শতকের শেষ পঁচিশ বছর থেকেই প্রসার লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মও আগের যুগের তুলনায় ঢের বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল।' 'এমনকি বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শও অনেকটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁদে গড়ে উঠেছিল। বাঙলাদেশে পাল-আমল থেকে বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই তন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে; এর পেছনে প্রাচীনতর বাঙালী ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং একাধিক তিব্বতী অভিযানের কিছুটা প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। 'একশো বছরের ডামাডোলের মধ্যে কোন্ নতুন স্রোত যে বাঙলার সংস্কৃতিতে বইতে শুরু করেছিল ইতিহাস তার কোনো হিসাব, এমনকি ইঙ্গিত ও রাখেনি।'

পাল বংশ

গোপাল॥ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি, আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার সার্বভৌম নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন গোপালদেব। সুদীর্ঘ চারশো বছর ধরে এই রাজবংশ রাজত্ব করেন। কিন্তু গোপালদেবের বংশপরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। গোপালদেব ও তাঁর বংশধরেরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পরবর্তী পাল-রাজাদের তাম্রশাসনে বলা আছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপ্যট শক্রুর দমন ও বিপুল কীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে ভূষিত করেছিলেন।' এর থেকে মনে হয় কোনো রাজবংশে গোপালের জন্ম হয়নি এবং গোপালও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রবীণ ও নিপুণ যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। নইলে এই সংকটের সময় বাঙলার সামন্তনায়কেরা নিশ্চয়ই কোনো বংশমর্যাদাহীন ও যুদ্ধানভিজ্ঞ যুবককে রাজপদে নির্বাচিত করতেন না। গোপালের সিংহাসনারোহণের প্রায় চারশো বছর পরে রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমিকে পালরাজাদের 'জনকভূ' বা পিতৃভূমি হিসাবে বলা আছে। এ থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে গোপাল বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গোড়াতেই সারা বাঙলার অধিপতি হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর রাজ্যকালেই সারা বাঙলা তাঁর শাসনাধীনে এসেছিল এবং বহুদিন পরে বাঙলা আবার শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখল। এইটেই গোপালের প্রধান কীর্তি।

ধর্মপাল ॥ গোপালের মৃত্যুর পর অনুমানিক ৭৭০ সালে তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। সারা উত্তরভারতের একরাট হবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন শশাঙ্ক তা আবার ধর্মপালকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রতিহারবংশীয় বৎসরাজ। আর্যাবর্তব্যাপী সাম্রাজ্যস্থাপন শুধু ধর্মপালের কল্পনাই জাগায় নি, জাগিয়েছিল বৎসরাজ ও দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবেরও। বৎসরাজের সঙ্গে যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে আবার বৎসরাজ পরাজয় স্বীকার করলেন। কিন্তু ধ্রুবের সঙ্গেও ধর্মপালের বিরোধ বাধল। ইতিমধ্যে ধর্মপাল মগধ, বারাণসী, প্রয়াগ ও গঙ্গাযমুনার দোয়াবও জয় করেছেন। ধ্রুবের হাতে ধর্মপাল পরাস্ত হলেও ধ্রুব দক্ষিণাপথে শিগগিরই ফিরে যাওয়ায় উত্তর-ভারতে ধর্মপালের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। তিনি সহজেই কিছুদিনের ভিতরে ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ), মৎস্য (আলওয়ার ও জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য-পাঞ্জাব), গান্ধার (পশ্চিম পাঞ্জাব), কুরু (পূর্ব-পাঞ্জাব), কীর (উত্তর পাঞ্জাব বা কাংড়া জেলা), যবন (সিন্ধুনদ-তীরবর্তী কোনো আরবরাষ্ট্র), যদু (পাঞ্জাবের সিংহপুর), অবন্তী (বর্তমান মালব) প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। এইভাবে আর্যাবর্তের সার্বভৌমত্ব লাভ করে কনৌজ বা কান্যকুব্জে যে অভিষেকের বন্দোবস্ত করেন তাতে ঐসব রাজারা তাঁকে রাজচক্রবর্তী হিসাবে স্বীকার করে নেন, আর তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি নেন। এই সমস্ত রাজ্য তাঁর অধীন হলেও শুধু বাঙলা ও বিহার তাঁর নিজের শাসনাধীন ছিল। অপরেরা ধর্মপালের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিজের নিজের রাজ্য নিজেরাই শাসন করতেন। কেবল কনৌজের সিংহাসনে তিনি

ইন্দ্ররাজকে সরিয়ে চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসনে বসান। কিন্তু নিরুদ্বেগে এই সাম্রাজ্যভোগ ধর্মপালের কপালে ছিল না। সম্ভবত তিনি নেপালও অধিকার করেন। এবং নেপাল-দখল নিয়েই বোধ হয় তিব্বতরাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। প্রতিহাররাজ বৎসের পুত্র নাগভট শক্তিসঞ্চয় করে কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। চক্রায়ুধ ধর্মপালের শরণাপন্ন হন এবং যুদ্ধে নাগভট জয়লাভ করেন। কিন্তু এবারও অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রকূটরাজ নাগভটকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সম্ভবত ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ নতি স্বীকার করেন। আবার, এ-ও হতে পারে যে ধর্মপাল নতি স্বীকার না করেও গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। যাইহোক, নাগভটকে পরাজিত করে গোবিন্দ স্বরাজ্যে ফিরে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মপাল নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় অধিপতি ছিলেন।

ধর্মপালের রাজ্যকাল বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। একদিক থেকে তাঁর রাজ্যকাল বাঙালীর জীবনপ্রভাত।

বিভিন্ন সমসাময়িক রচনায় তাঁর শৌর্য ও সম্রাটোচিত গৌরবের বর্ণনা রয়েছে। সে-বর্ণনার মধ্যে যেটুকু আতিশয্য আছে তা বাঙালীর তখনকার জাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক। বাঙালী জনসাধারণও যে তাঁকে অসীম প্রীতির চোখে দেখত, হাটে-মাঠে ঘাটে লোকে যে তাঁর যশোকীর্তন করত, তা-ও এই কবিরা লিখেছেন। কিন্তু সারা উত্তরভারতের প্রথম বাঙালী রাজচক্রবর্তী সম্রাটের কথা, এমনকি নাম পর্যন্ত, বাঙলাদেশ প্রায় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

মাত্র কয়েকখানি তাম্রশাসন, শিলালিপি ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে তাঁর সম্বন্ধে স্বল্প দুচারটি মাত্র কথা আমরা জানতে পারি।

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোনো রাজকন্যা রন্নাদেবীকে বিয়ে করেন। তাঁর পুত্র দেবপাল রন্নাদেবীরই পুত্র। ধর্মপালের ভাই বাক্‌পাল তাঁর সেনাপতি ছিলেন আর গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রী। সাম্রাজ্যস্থাপনে এঁরা দুজনে ধর্মপালকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

ধর্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। মগধের বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বরেন্দ্রভূমিতে সোমপুর নামক জায়গায় তিনি আরেকটি বিহার স্থাপন করেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে এর বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত বিহারের ওদন্ত-পুরেও তিনি একটি বিহার স্থাপন করেন।

বৌদ্ধ হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি ধর্মপালের বা তাঁর বংশধরদের কোনো বিরাগ ছিল না। হিন্দুধর্মের অনুশাসন ও বর্ণভেদ তিনি মেনে চলতেন। ব্রাহ্মণ গর্গ ও তাঁর বংশধরেরা পালরাজাদের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন।

দেবপাল ॥ ধর্মপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৮১০ সালে দেবপাল রাজা হন। পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। সেসময়ে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটেরা তখনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নিকটেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ) ও উৎকল পরাক্রান্ত হয়ে উঠছে; এমতাবস্থায় দেবপাল রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। বাক্‌পালপুত্র জয়পাল ছিলেন সেনাপতি। গর্গপুত্র দর্ভপাণি ও প্রপৌত্র কেদারমিশ্র দুজনেই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এঁরা দেবপালকে রাজ্যবিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেন, এবং দেবপাল

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সারা আর্যাবর্তের কর ও প্রণতি আদায় করতেন।

উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ তাঁর অধীন হয়। হূন-দ্রবিড়-গুর্জর-নাথের দর্প তিনি চূর্ণ করেন। উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিজয়ী অভিযান তিনি চালিয়েছিলেন। প্রতীহাররাজ ভোজদেব পরাস্ত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষও সম্ভবত পরাজয় বরণ করেন। দেবপাল সম্ভবত ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময়েই পালসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। সমগ্র উত্তর ভারত তাঁকে একরাট হিসাবে স্বীকার করত। ভারতের বাইরেও যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব নালন্দা মহাবিহারে একটি মঠ স্থাপন করে তার খরচের জন্য দেবপালের অনুমতি নিয়ে পাঁচটি গ্রাম দান করেন।

ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে বাঙলার সমৃদ্ধি বিস্ময়করভাবে বেড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধর্মপাল ও দেবপাল সমগ্র আর্যাবর্তে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই সাম্রাজ্য গঠনই এঁদের সময়কার সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে এইরকম শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচয় এর আগে বা পরে আর কখনও পাওয়া যায় নি।

১ম বিগ্রহপাল॥ দেবপালের মৃত্যুর পরই পালসাম্রাজ্যে আস্তে আস্তে ভাঙন শুরু হল। তাঁর পরবর্তী তিনশো বছরের পালবংশের ইতিহাস 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় এগিয়ে চলছিল। সুদীর্ঘ চারশো বছর পরে পালবংশের বিলোপ ঘটে। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল

রাজত্ব করার ইতিহাস সারা ভারতে আর কোনো রাজবংশেরই নেই বললেও চলে। সেদিক দিয়েও পালবংশের ইতিহাস বিস্ময়কর।

দেবপালের মৃত্যুর পর ১ম বিগ্রহপাল রাজা হন। তিনি দেবপালের পুত্র ছিলেন না। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি ধর্মপালের ভাই বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র। দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজা হন নি। এর কোনো সঙ্গত কারণ জানা যায় না। গৃহবিবাদও এর কারণ হতে পারে। বিগ্রহপাল শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। অল্প কিছুদিন পরেই পুত্র নারায়ণপালকে রাজ্য দান করে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

নারায়ণপাল॥ নারায়ণপাল অন্তত ৫৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনিও পিতার ন্যায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। নারায়ণপালের আমলে বিশাল পালসাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়, এমনকি বিহার ও বাঙলার কোনো কোনো অংশ পর্যন্ত বহিঃশত্রুর দখলে চলে যায়। রাষ্ট্রকূটরাজ অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে বিজয়ী অভিযান পাঠিয়েছিলেন। বোধহয় এই সময়েই উড়িষ্যার শুল্কবংশীয় মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিছু অংশ অধিকার করেন। প্রতীহাররাজ ভোজ কলচুরি ও গুহিলোট রাজাদের সাহায্যে নারায়ণপালকে পরাজিত করে মগধ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পালসাম্রাজ্য অধিকার করেন। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল বিহার ও উত্তর বঙ্গ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। এই সময়েই সম্ভবত কলচুরিরাজ কোক্কল্ল বঙ্গ আক্রমণ করে বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এইভাবে নবম শতকের শেষ ভাগে পালরাজাদের নিজ রাজ্যও শত্রুর করতলগত হয়। কামরূপ ও উৎকলের রাজারা এই সময়ে

প্রবল হয়ে ওঠেন। নারায়ণপাল শেষ বয়সে অবশ্য বিহার ও বাঙলায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে সক্ষম হন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল ও তৎপুত্র ২য় গোপাল রাজত্ব করেন। রাজ্যপাল ও গোপাল অনেকটা নির্বিবাদে রাজত্ব করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। ২য় গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপালের সময়ে মগধ বোধহয় পালবংশের হস্তচ্যুত হয়। উত্তরভারতের চন্দেল্লরাজ ও কলচুরিরাজগণ এই সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা ও তাঁর পুত্র ধঙ্গ গৌড়, রাঢ় ও অঙ্গদেশ জয় করেন। কলচুরি-রাজ ১ম যুবরাজ ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণরাজ গৌড় ও বঙ্গালদেশ জয় করেছিলেন। এই সময়ে বাঙলাদেশ আবার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। রাঢ় ও বঙ্গালদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে।

এই সময়ে দশম শতকে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় কয়েকজন রাজার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কাম্বোজবংশীয়দের উৎপত্তি রহস্যাবৃত।

পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গও এই সময়ে স্বাধীন হয়ে যায়। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করতেন। রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। এঁর অল্পকিছুদিন পরেই কুমিল্লা অঞ্চলে লয়হচন্দ্রদেব রাজত্ব করেন। চন্দ্র উপাধিধারী এক বৌদ্ধ রাজবংশ দশম শতকের শেষদিকে হরিকেলে রাজত্ব করতেন। এই বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়—পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর অর্থাৎ বঙ্গ ও বঙ্গাল বললে যে দেশ বোঝাত, তাই ছিল এঁদের রাজ্য। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে

গোবিন্দচন্দ্র দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলায় রাজত্ব করতেন। চন্দ্ররাজাদের কলচুরিরাজ ও গোবিন্দচন্দ্রকে একজন চোলরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

মহীপাল॥ সমস্ত বাঙলাদেশই পালরাজাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। আনুমানিক ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২য় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল রাজা হন। তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের হারানো পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের খানিকটা পুনরুদ্ধার করে মহীপাল পাল-বংশের লুপ্ত গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। সারনাথে নতুন মন্দির তৈরি ও জীর্ণ মন্দির সংস্কার, নতুন নতুন বিহার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার, বুদ্ধগয়ায় মন্দির নির্মাণ ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাঙলাদেশ তার স্থান ফিরে পেয়েছিল। পালবংশের নতুন করে মাথা তোলবার চেষ্টার ভিতর বাঙালী তার দেশ ও রাষ্ট্রের আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়েছিল। তাই মহীপালের গান লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদ আজও সেই স্মৃতিবহ। বহু নগর ও দীঘির সঙ্গেও মহীপালের নাম জড়ানো।

সমসাময়িক হিন্দুশক্তিপুঞ্জ গজনীর সুলতান মামুদের বারবার আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিলেন বলেই বোধহয় মহীপাল লুপ্ত সাম্রাজ্যের খানিকটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

মহীপাল পালরাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার ভেঙে পড়তে লাগল। মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে কলচুরিরাজ কর্ণের হাতে বঙ্গ-গৌড় পরাজিত হয়। নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপালের আমলে কর্ণ আবার বাঙলা আক্রমণ করে পশ্চিম বাঙলার কিছুটা অধিকার

করেন। এই আক্রমণের পরেই বোধহয় কর্ণকন্যার সঙ্গে বিগ্রহ-পালের বিয়ে হয়।

কর্ণের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পশ্চিমবঙ্গ পালরাজ্যবহির্ভূত হয়ে পড়ে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ বর্ধমান অঞ্চলে ঢেক্করীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গে দুটো স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। একটি ত্রিপুরা অঞ্চলের পট্টিকেরা রাজ্য, অপরটি পূর্ববঙ্গের বর্মবংশ। পালরাজারা আর কোনোদিনই পূর্ববঙ্গ জয় করতে পারেন নি।

৩য় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটের একাধিক চালুক্যরাজ বাঙলায় বিজয়াভিযান চালান। এই সূত্রেই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্তপরিবার ও অন্যান্য লোক বাঙলাদেশ এসে বসতি স্থাপন করেন। সেনরাজবংশ ও বঙ্গের বর্মবংশ এই কর্ণাটী পরিবার থেকেই উদ্‌ভূত। এগারো শতকে উড়িষ্যাধিপতি মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড় ও রাঢ় জয় করেন। মগধেও পাল-আসন টলে ওঠে এবং পালরাজ্য এসব আক্রমণে একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হল।

৩য় বিগ্রহপালের তিন পুত্র : ২য় মহীপাল, ২য় শূরপাল ও রাম-পাল। ২য় মহীপাল রাজা হবার পর রাজপরিবারেই অন্তর্বিরোধ শুরু হয়, সামন্তদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত। মহীপাল দুই ভাইকে বন্দী করেন। বরেন্দ্রের কৈবর্তসামন্তদের দমন করতে গিয়ে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। এবং কৈবর্তনায়ক দিব্য বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করেন।

দিব্য॥ পালরাজাদের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। পাল-রাজ্যের দুর্বলতা ও রাজপরিবারের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে তিনি

বিদ্রোহ করেন। বরেন্দ্রে তাঁর প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বর্মরাজ জাতবর্মা ও রামপালের আক্রমণ থেকে তিনি বরেন্দ্র রক্ষা করেছিলেন। দিব্যর পরে তাঁর ভাই রুদোক ও তৎপুত্র ভীম বরেন্দ্র শাসন করেন।

রামপাল॥ রামপাল রাজা হয়ে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। ভীমের রাজত্বকালে বরেন্দ্রের কৈবর্তশক্তি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। রামপাল বহুকষ্টে সামন্তরাজাদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। ভীম সপরিবারে রামপালের হাতে নিহত হন। পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করে রামপাল বর্মরাজাকে বশীভূত করেন। কামরূপ ও উড়িষ্যার কিয়দংশও তিনি জয় করেন। এই সময়ে কর্ণাটীদের আক্রমণে মিথিলা রামপালের হাতছাড়া হয়। কনৌজের গাহড়বাল বংশও বাঙলার দিকে লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

রামপালের চার ছেলে: বিত্তপাল, রাজ্যপাল, কুমারপাল ও মদনপাল। প্রথম দুজন রাজা হতে পারেন নি। মদনপালের পরই পালরাজ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে।

কামরূপ স্বাধীন হয়, পূর্ববঙ্গ বর্মরাজ ভোজের নেতৃত্বে স্বাধীন হল। কলিঙ্গের রাজারা মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে গঙ্গাতীর পর্যন্ত চলে এলেন। সুযোগ বুঝে পূর্ববঙ্গে-আধিপত্য-বিস্তারকারী সেন-রাজবংশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। গাহড়বাল রাজাও পাটনা ও মুঙ্গের দখল করে নিলেন। যেটুকু অবশিষ্ট রইল মদনপালের মৃত্যুর দশবছরের মধ্যে সেটুকুও গেল।

'পালরাজত্বের এই চারশো বছর বাঙালীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই হয়েছে আজকের বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির

গোড়াপত্তন। আর্যপূর্ব ও আর্য সংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালীর যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই যুগেই তার ভিত তৈরি হয়ে যায়।'

বাঙলাদেশে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার সূচনা শশাঙ্কর আমলেই দেখা দেয়। একশো বছরের মাৎস্যন্যায়ের পরে পালসাম্রাজ্যে তা আবার জেগে ওঠে। 'বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ, বাঙালীর এক-জাতীয়ত্বের ভিত্তিও এই চারশো বছরের ভিতরেই গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে তার ভৌগোলিক সত্তা আর সূত্রপাত হয় বাঙলা লিপি ও ভাষার।'

'পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে বাঙলাদেশে প্রথম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবহির্ভূত স্মৃতি ও আচার, আর্য ও আর্যবহির্ভূত সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ, দেবদেবী সমস্তই পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে পরস্পরে মিলেমিশে এক বিরাট সামাজিক সমন্বয় গড়ে তুলেছে। আর্যব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির ছাঁচেই অবশ্য এই সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। ভূমিব্যবস্থা, উত্তরাধিকার, চাতুর্বর্ণ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বীকৃতি ও প্রচলনের মধ্যেই সেই আদর্শ সুস্পষ্ট। আর্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই ক্রমশ উত্তরভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে বাঙলাদেশ যুক্ত হল। গুপ্ত আমলেই এর সূত্রপাত হয়েছিল, পাল আমলে তা পূর্ণতা নিয়ে দেখা দিল। পাল আমলের এই সমন্বিত ও সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি।'

বাঙলাদেশে সামন্ততন্ত্রের যে বিকাশ শুরু হয়েছিল গুপ্ত আমল থেকে পালসাম্রাজ্য এসে তা পূর্ণতা লাভ করল। পাল আমলে বিজিত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই থাকত। শুধু সম্রাটকে

রাজচক্রবর্তী হিসাবে মেনে নিলেই হল। সেইজন্যে সম্রাট দুর্বল হলেই সাম্রাজ্যও টলে উঠত আর সামন্তেরা আপন প্রভুত্ব স্থাপন করতেন। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রও বেড়ে ওঠে। জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই রাজকর্মচারীদের হাত ছিল। প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতির প্রচুর ক্ষমতা ছিল। তাঁরাও যে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছিলেন পালবংশের ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই সময়ে শিল্প-ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতি ঘটায় ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারই মুখ্য ও সেই সংক্রান্ত কর্মচারীদের পদই বেশি। ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা যেমন বেড়ে চলেছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও তেমনিই আসন গেড়ে বসছিল।

সেনবংশ

সেনরাজাদের পূর্বপুরুষেরা বাঙলাদেশে এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট প্রদেশ থেকে। সেনরাজারা ঠিক কখন বাঙলাদেশে আসেন তা অজ্ঞাত। তাঁরা রাঢ় অঞ্চলে বাস করতেন। সামন্তসেনের প্রথম বয়স কর্ণাটে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কেটে যায় ও শেষ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে বাস করতেন। যুদ্ধে শৌর্যের পরিচয় দিয়ে তিনি বংশের উন্নতি করেন। ফলে পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর পুত্র হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী সামন্ত রাজা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঠিক কী উপায়ে তাঁরা এদেশে এলেন তা বলা মুশকিল।

বিজয়সেন॥ রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্যের গোলযোগের সুযোগ নিয়ে বিজয়সেন নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। শূরবংশের রাজকন্যাকে বিয়ে করায় রাঢ়ে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিজয়সেনের সুবিধা হয়। বর্মরাজকে পরাভূত করে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ দখল করেছিলেন আর পালদের হাত থেকে উত্তর বঙ্গ কেড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে নানা যুদ্ধজয়ের ভিতর দিয়ে বিজয়সেন সারা বাঙলাদেশে একটি অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙলার রাজনৈতিক বিরোধের অবসান করে বিভিন্ন সামন্তদের সংকীর্ণ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে একরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করাই বিজয়সেনের কৃতিত্ব। বিজয় সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৯৫ থেকে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বল্লালসেন॥ বিজয়সেনের ও বল্লালসেনের আমলে সেনরাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল।

প্রধানত শাস্ত্রচর্চা ও সমাজসংস্কারক হিসাবেই বল্লালসেন বাঙলাদেশে সুপরিচিত। কিন্তু মনে হয় শস্ত্রচালনাতেও তিনি হীন ছিলেন না। চালুক্যরাজকন্যা রামদেবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ শেষ করার আগে তিনি রাজ্যভার পুত্রের হাতে দিয়ে সপত্নীক গঙ্গাতীরে চলে যান।

লক্ষ্মণসেন॥ প্রায় ষাট বছর বয়সে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখনই শৌর্যেবীর্যে তিনি প্রখ্যাত। তাঁরই সময়ে গৌড়-কামরূপ, কলিঙ্গ সেনরাজ্যভুক্ত হয়। এ ছাড়া তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ স্থাপনা করেন। লক্ষ্মণসেন গাহড়বালের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান চালিয়ে মগধ অধিকার করেন। এর ফলে গাহড়বালেরা বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে ও মুসলমানদের উপযুক্ত প্রতিরোধ দিতে অক্ষম হয়।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে উঠেছিল। সামন্তদের আত্মকর্তৃত্বের ঝোঁক তাঁর বার্ধক্যের সুযোগে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে সুন্দরবন অঞ্চলে ডোম্মনপাল নাম এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়ে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই সময়ে, কিংবা এর ঠিক পরেই ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরায় রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব নামে এক রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে বোধহয় তাঁর রাজধানী ছিল।

মেঘনার পূর্বতীরে এই সময়ে মধুমথনদেব বা মধুসূদনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র বাসুদেব। বাসুদেবাত্মজ দামোদরদেবই এই বংশের পরাক্রান্ত নৃপতি। তাঁর রাজ্য ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। পরে এই বংশের এক

রাজা দশরথদেব ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন।

বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়॥ বাঙলাদেশে রাষ্ট্রের ভিতরে যখন ভাঙন চলেছে সেই সময়ে পশ্চিম দিক থেকে মুসলমান শক্তি আস্তে আস্তে পুবদিকে তার হাত বাড়াতে শুরু করেছে। উত্তরভারতের হিন্দুরাজশক্তি তখন বিচ্ছিন্ন। সেজন্যে তাদের পক্ষে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। এই সময়ে বখ্‌তিয়ার নামে এক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ভাগ্যান্বেষণে বাঙলা-বিহার জয় করতে আসেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিহার জয় করেন। তার পরের বছর তিনি ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে নদীয়ার দিকে এগোন। অতর্কিতে নবদ্বীপের ভিতরে সসৈন্যে ঢুকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছলে লক্ষ্মণসেন খিড়কি দরজা দিয়ে পালাতে বাধ্য হন। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। নদীয়া ধ্বংস করে বখ্‌তিয়ার গৌড়ে গিয়ে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন।

বখ্‌তিয়ারের বিনা বাধায় বাঙলা-বিহার জয়ের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, মুসলমান-শক্তির বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের হিন্দু-রাজশক্তির প্রতিরোধ ভেঙে পড়ায় তাদের বাধা দেবার মতো সাহস বা শক্তি সেনরাষ্ট্রের ছিল না। দ্বিতীয়ত, পরাজয়ের মনোভাব রাষ্ট্রকে পেয়ে বসেছিল। তার প্রমাণ রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, বণিক, রাজপুরুষ সকলেই জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, সৈন্যাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টারা পরাজয়ের মনোভাবে আচ্ছন্ন, জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রের নিয়ামক—সেখানে যে-কোনো প্রতিরোধই নিষ্ফল। সেই জন্যেই অত সহজে বাঙলায় মুসলমানবিজয় ঘটে।

লক্ষ্মণসেন পালিয়ে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে আরও একশো বছর সেনেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পর বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন রাজত্ব করেন। তারপরই সেনবংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তেরো শতকের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলায় স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য থাকলেও তারপরে বাঙলাদেশের কোথাও কোনো স্বাধীন হিন্দুরাজার নাম পাওয়া যায় না।

সেন আমলে সামন্তদের আত্মকর্তৃত্বের ঝোঁক ও আমলাতন্ত্র আরও বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে আভ্যন্তরিকভাবে বাঙলাদেশ অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। শিল্প-বাণিজ্যের অধঃপতনে সমাজ আরও বেশি ভূমি-ও-কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। এই আমলের প্রধান চেষ্টা ছিল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজ আগাগোড়া সেজে ঢালা। এ-চেষ্টায় রাষ্ট্র ও রাজবংশের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তার উপর কর্ণাটী সেনবংশকে বাঙালী জনসাধারণ কখনো আপন বলে ভাবে নি। পাল রাজারা ছিলেন বাঙালী। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল নিবিড়। পালদের নিয়ে বাঙলাদেশে যে জাতীয়তাবোধ ও আদর্শের অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেন আমলে বিদেশাগত রাজাদের নেতৃত্বে তা হয় নি। বরং গোঁড়া ব্রাহ্মণ মতে বাঙলার সমাজবিন্যাস ও বর্ণভেদ বাঙালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে দিয়েছিল। এর মাঝখানে একজাতীয়ত্বের কোনো আদর্শই কাজ করে নি। সমাজ আচ্ছন্ন এই ভেদবুদ্ধিতে, রাষ্ট্রের সঙ্গে নেই সাধারণের যোগাযোগ। রাজসভা চরিত্রহীনতার পাঁকে ডুবে গেছে, শক্তিহীনতা জাঁকিয়ে বসেছে জ্যোতিষের আশ্রয়ে। শিল্পসাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে দেহসর্বস্বতায়

মজেছে। জনসাধারণ বজ্রযান-সহজযানের ও অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের বীভৎস ও বিকৃত যৌনসর্বস্বতায় পঙ্কিল ও পঙ্গু। এর ভিতরে সুস্থ জীবনের কোনো লক্ষণই নেই বলা চলে। একটা যুগের পতনের সমস্ত উপাদানই তৈরি। আর এই অবস্থায় বিদেশী শক্তির বাঙলাবিজয় মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর তা বাঙলার, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতিরই অনিবার্য ফল।

রাজ্যশাসনপদ্ধতি

বাঙলাদেশের ইতিহাসে রাজ্যশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে গুপ্ত আমলের আগেকার কোনো খবর আমরা পাই না। কিন্তু এটুকু জানি যে মানুষের ইতিহাসের গোড়ার যুগে কোনো রাজা ছিল না, রাষ্ট্র ছিল না। তখন মানুষ কৌমসমাজের আওতায়। বাঙলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কৌমসমাজব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্রের কিছু কিছু রেশ আমরা বাঙলাদেশের সর্বত্রই দেখতে পাই। 'সমাজের একেবারে নিচের কোঠায়, গারো-সাঁওতাল-রাজবংশী প্রভৃতি পাহাড়ী ও জংলী কোমদের মধ্যে পঞ্চায়েতী প্রথায়, দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, আচার-অনুষ্ঠানে, চাষের জমি ও শিকারভূমির বিলি-বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকার শাসনে সুপ্রাচীন কৌমসমাজের স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়।'

ক্রমে এই সমাজ বিবর্তনের পথে ভেঙে যায়, এর ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। বাঙলাদেশে ঠিক কখন এ-ঘটনা ঘটে বলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই বাঙলাদেশে রাজতন্ত্র দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের মন থেকে তাই বলে আদিম কৌমশাসন একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। সামাজিক শাসনের মধ্যে তার স্মৃতি এখনো জেগে আছে।

রাজতন্ত্র সম্বন্ধে বাঙলাদেশের প্রথম সঠিক খবর পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। গ্রীক লেখকরা গঙ্গরিদাই বা গঙ্গারাষ্ট্র

সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় যে বাঙলায় তখন রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। কারণ রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে বিধিবদ্ধ না হলে অমন পরাক্রান্ত রাষ্ট্র সম্ভব নয়। মহাভারত ও পুরাণের সাক্ষ্যমতে বাঙলায় রাজনৈতিক জ্ঞানের বেশ প্রসার হয়েছিল। নইলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা ও মিলিত হয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কী করে সম্ভব ?

মৌর্যযুগের যে একখানি মাত্র লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে 'মহামাত্র' নামীয় রাজকর্মচারী পুণ্ড্রবর্ধনের শাসন পরিচালনা করতেন। একবার প্রজাদের দুরবস্থা হওয়ায় তাদের ধান ও অর্থ ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত মৌর্যদের সুপরিচিত রাজ্যশাসনব্যবস্থা বাঙলায়ও প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বাঙলাদেশের অধিকাংশই গুপ্ত-অধিকারে গিয়েছিল। কিন্তু এর একাংশমাত্র গুপ্ত-সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। অনেক অংশই থাকত সামন্ত রাজা বা রাজপ্রতিনিধিদের অধীনে। সামন্ত রাজারা নিজের নিজের অংশ প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসন করতেন। তাঁদের রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল কেন্দ্রীয় যন্ত্রের অনুকরণে তৈরি করা। এইসব সামন্ত-মহাসামন্তরা কখনো কখনো 'মহারাজ' উপাধি নিতেন। এঁরা অবশ্য সম্রাটের সর্বাধিপত্য মেনে চলতেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্য জোগাতেন ও নিজেরা যোগ দিতেন। আবার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগে নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করতেন। সামন্ততন্ত্রের এই চেহারা সারা প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস জুড়ে। গুপ্ত আমলে এর সূত্রপাত, পাল আমলে বিকাশ ও সেন আমলে চরম পরিণতি।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গুপ্ত আমলে দেশ ছিল বড় বড়

কতকগুলি ভাগে ভাগ করা। সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি আবার কয়েকটি বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই সবচেয়ে ছোট দেশবিভাগ।

সম্রাট স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। তাঁর উপাধি ছিল উপরিক বা পরবর্তীকালে উপরিক-মহারাজ। বিষয়-শাসনকর্তা ছিলেন বিষয়পতি, তাঁকে কুমারামাত্য ও আয়ুক্তকও বলা হত। এ-ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন রাজকর্মচারী ছিলেন।

প্রত্যেক বিভাগেরই একটি করে অধিকরণ বা কার্যালয় থাকত। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক ও প্রথম-কায়স্থ—এঁরাও বিষয়পতির সঙ্গে একত্রে শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। শেষ নাম তিনটি থেকে মনে হয় ব্যবসায়ী, কারিকর ইত্যাদি গোষ্ঠীর দল-পতিরা অধিকরণের সভ্য ছিলেন। ভূমি বিক্রয়, মাপজোক ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজকর্ম অধিকরণ থেকে করা হত। এই সংক্রান্ত কাজের কর্মচারীকে পুস্তপাল বলা হত। বীথি, গ্রাম প্রভৃতির নিজস্ব শাসক ও অধিকরণ ছিল। গ্রামের কর্তাকে বোধহয় গ্রামিক বলা হত। বীথি-অধিকরণে মহত্তর, অগ্রহারী প্রভৃতিরা শাসন-কার্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ছাপ ছিল অনেক বেশি।

শিল্প ও বাণিজ্যবহুল জনপদে ঐ সবের প্রতিনিধিরা স্থান পেতেন। যেমন বীথি ও গ্রামে কৃষিসম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা পেতেন। রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থবান ও ভূমিবান শ্রেণীকে এযুগে অবজ্ঞা করতে পারে নি।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙলায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলেও শাসনযন্ত্র কিন্তু গুপ্ত আমলের মতোই থেকে গেল। আগের ও

পরের যুগের মতোই এযুগেও গোড়ার কথা হল রাজতন্ত্র ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা। এতে জমির মালিক রাজা, কোনো ব্যক্তি নয়। অন্য কোনো লোকের জমিতে কোনো স্বত্ব ছিল না। রাজানুমতি ছাড়া জমি দান বা হস্তান্তর করা যেত না।

পালবংশের প্রতিষ্ঠার পর বাঙলার রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল। গুপ্তযুগের কাঠামো অর্থাৎ ভুক্তি, বিষয় ইত্যাদি বর্তমান ছিল। এর শাসনব্যবস্থার কোনো বদল হয়েছিল বলে মনে হয় না। সাম্রাজ্যস্থাপন ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-উপাধিও বাড়তে শুরু করে। তখন আর 'মহারাজাধিরাজ'-এ চলে না। গুপ্ত সম্রাটদের অনুসরণে পরমদৈবত পরমেশ্বর পরমভট্টারক প্রভৃতি এসে জুটল। পাল আমলেই মন্ত্রী বা সচিব নামে এক রাজপুরুষের খবর পাওয়া যায়। ইনি রাজার প্রধান উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান সহায়ক।

সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি পাল আমলে আগের চেয়ে পাকা হয়। রাজন্, রাজনক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি অনেক রকম শ্রেণী বিভাগ এঁদের মধ্যে ছিল।

সে-সময়ে রাজারা শাসন ছাড়াও সমাজ ও অর্থনীতি, এমনকি ধর্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন।

পাল আমলে রাজ্যশাসনযন্ত্র বেশ বিধিবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বিভাগে শাসনকার্য ভাগ করে কাজ চালানো হত। বিভিন্ন ক্ষমতার ও স্তরের প্রচুর রাজকর্মচারী ছিলেন। কেন্দ্রীয় বিভাগ, বিচার বিভাগ, জরিপ বিভাগ, পুলিস বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, নৌ ও সমরবিভাগ প্রভৃতি বিভাগ ও তাদের উপবিভাগে এঁরা একটা বেশ বড়রকমের আমলাতন্ত্রও গড়ে তুলেছিলেন।

আগেকার আমলে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের যেটুকু যোগাযোগ ছিল এই যুগে তাও গেল। শুধু গ্রাম প্রভৃতির কাজেই যা-একটু সংযোগ রইল। সমাজবিন্যাসের একটা বড় অংশ রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

এই ধারাই সেন ও অন্যান্য রাজাদের আমলে আরও ফেঁপে ফুলে প্রবল চেহারায় দেখা দিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসল। কেন্দ্র থেকে গ্রাম ও পাড়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের বাহু বিস্তৃত হল। রাজকর্মচারীদের সংখ্যাও সে-তুলনায় বেড়ে গেল। শাসনবিভাগের বিভিন্ন আমলাতন্ত্র আরও জোরদার হল। তাদের জন্য নতুন নতুন পদ তৈরি হল।

মোটামুটি এইরকম ছিল প্রাচীন বাঙলার রাজ্যশাসনপদ্ধতি। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হলেও এই ব্যবস্থার বিশেষ কোনো অদলবদল হয় নি। রাজারা চিরাচরিত সংস্কার, শাস্ত্র ও ধর্ম মেনে চলতেন। সামন্ত ও উপদেষ্টাদের মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজই তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব ছিল। রাজপুরুষেরা ক্ষমতার অপব্যবহারও করতেন। তাঁদের নিবৃত্ত করা ছিল কঠিন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

'প্রাচীন বাঙলায় একেবারে গোড়ার যুগে সামাজিক ধনদৌলতের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌমকৃষি এবং ছোটখাটো গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাস এবং গৃহশিল্প ধন উৎপাদনের বড় উপায় হলেও প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন ছিল একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর।' অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলায় ধনোৎপাদনের উপায় ছিল তিনটি: কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য।

কৃষি॥ প্রাচীন বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি একটা বড় রকমের জায়গা জুড়ে ছিল। আট থেকে তেরো শতক পর্যন্ত কৃষি ও কৃষক-সংক্রান্ত প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনকার মতোই সে-সময়েও ধান ছিল প্রধান শস্য। খুব প্রাচীনকাল হতেই এদেশে আখের চাষ হয়। পুণ্ড্রদেশে খুব ভালো আখের চাষ হত। পুণ্ড্রদেশ থেকে আখের এক নাম পুঁড় আর গৌড় নাম বোধহয় গুড় থেকে এসেছে। প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় বাঙলাদেশে তৈরি হয়ে বিদেশে চালান যেত। এছাড়াও তুলো ও সরষের চাষও বেশ হত। কার্পাসবস্ত্র বাঙলাদেশের প্রাচীন জিনিস। পানের চাষও খুব পুরোনো। ফলমূলের মধ্যে নাম পাওয়া যায়—আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেবু, নারকেল, সুপারি, খেজুর, বীজফল প্রভৃতির।

বাঁশ আর কাঠ অর্থাগমের একটা বড় উপায় ছিল। ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে নানারকম জিনিসপত্রও বাঁশ থেকে তৈরি হত। এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, লঙ্কা, লাক্ষা—এসবও বাঙলার নানা অংশে জন্মাত।

বাঙলার সমুদ্রতীরে আবহমান কাল থেকেই লবণ তৈরি হয়ে আসছে।

বিদ্যাপতির মতে বাঙলার সেরা জিনিস ছিল ঘি। তাই বাঙলাকে তিনি বলেছিলেন 'আজ্যসার গৌড়' (আজ্য = ঘি)।

খনিজ॥ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের মতে পুণ্ড্রদেশ একসময় হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্র ও ত্রিপুর বা ত্রিপুরায় হীরাখনির উল্লেখ করেছেন। বজ্রভূমি বা উত্তররাঢ়ে খুব সম্ভবত হীরার খনি ছিল।

আসাম আর উত্তর ব্রহ্মের নদী বেয়ে কিছু সোনা বাঙলায় আসত। সোনার পরিমাণ অনেক হলেও তা খুব উঁচুদরের ছিল না। সুবর্ণরেখা নদী, সোনারগাঁ, সোনাপুর প্রভৃতি নাম বোধহয় এই সোনার স্মৃতি বহন করছে। রাঢ়ের দক্ষিণ সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। গৌড়িক নামে এক খনিজ রুপোর নাম কৌটিল্যে আছে। রাঢ়ের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আছে।

বাঙলাদেশের পশুপাখির সংখ্যা কম নয়। তবে হাতি-ধরার ও হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি এই বাঙলাদেশেই হয়েছিল।

শিল্প॥ খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকে বাঙলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই

ছিল প্রাচীন বাঙলায় সব থেকে প্রধান শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। কার্পাসের বিভিন্ন রকমের কাপড় ছাড়াও একরকমের কীটের লালায় তৈরি হত পত্রোর্ণ নামে রেশমের মতো কাপড়। পাটের কাপড়ও প্রচুর তৈরি হত। পট্টবস্ত্র পূজার অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু।

চিনি ও গুড়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। নানারকমের কারু-শিল্পও কম ছিল না। মণিমুক্তাখচিত সোনারুপার নানা গয়নার ব্যবহার ছিল প্রচুর। রাজারাজড়া ছাড়া বণিক ও ব্যবসায়ীরাও সোনা-রুপোর বাসনে খেতেন।

লৌহশিল্পেরও খুব প্রচলন ছিল। দা, কুড়োল, খন্তা, লাঙলের ফাল ছাড়াও বর্শা, তীর, তরোয়াল প্রভৃতি তৈরি হত। বাঙলাদেশের তরোয়ালের খুব সুনাম ছিল ধারালো আর মজবুত বলে।

মৃৎশিল্পের খুব প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও পোড়ামাটির যেসব কাজের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা উঁচুদরের। হাতির দাঁতের শিল্পের চল ছিল। একসময়ে বাঙালী শিল্পীরা খুব বিখ্যাত ছিলেন।

সূত্রধর বা ছুতোর বলতে কাঠের মিস্ত্রি ছাড়াও স্থপতি, তক্ষণকার, কাঠমিস্ত্রি, সবই বোঝাত। প্রাচীন বাঙলায় কাঠের শিল্প খুব উন্নত ছিল। গৃহস্থালির দরকারী নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করা ছাড়াও নৌকো ও সমুদ্রগামী পোত পর্যন্ত কাঠের দ্বারা তৈরি হত। প্রাচীন কাঠের স্তম্ভ, খিলান প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ শিল্পের কারুকাজ ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখলে অবাক হতে হয়।

এ-সব ছাড়া কাঁসা প্রভৃতি নানাপ্রকার মিশ্র ধাতুশিল্পেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমাজে এইসব কারুশিল্পীদের বিশেষ সম্মান ছিল।

ব্যবসাবাণিজ্য ॥ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যেরও উন্নতি হল। নদীবহুল বাঙলাদেশে শিল্পজাত দ্রব্যাদি একজায়গা থেকে আর একজায়গায় পাঠানো খুব সহজ ছিল। বাঙলার নানা জায়গায় এইজন্যে গঞ্জ, হাট ও নগর গড়ে ওঠে। প্রাচীন নগরগুলি প্রধানত বাণিজ্যেরও বড় কেন্দ্র ছিল। শিল্প ও বাণিজ্য থেকে রাষ্ট্রেরও প্রচুর আয় হত।

বাঙলার বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঙলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই অগ্রণী। স্থল-পথে ও জলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, লঙ্কাদ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জেও বাঙলার বাণিজ্যপোত যাতায়াত করত। সমুদ্রোপকূল ধরে বাঙলার বাণিজ্যপোত গুজরাট পর্যন্ত যেত পান, নারকেল, সুপারি, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে আর ফিরে আসত মরকত-মণি-শঙ্খ ইত্যাদি।

এই দেশবিদেশজোড়া বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থাগম হত। বিদেশের বাজারে স্বদেশী জিনিস বেচে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্য মুদ্রা দ্রম্ম এদেশে আসত। দ্রম্ম থেকেই 'দাম' কথাটা এসেছে।

মুদ্রা ॥ বাঙলাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব তিন-চার শতকেই মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে বাঙলায় 'গণ্ডক' নামে এক মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এটি সোনার কি রুপোর জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের বোধহয় কিছু আগেই নানা-চিহ্ন-আঁকা তামার বা রুপোর মুদ্রা ব্যাপকভাবে বাঙলাদেশে চলত।

গুপ্ত আমলে বাঙলাদেশে স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা রূপক বহুল পরিমাণে চলত। এছাড়া তামার মুদ্রাও ছিল। নিম্নতম মুদ্রা ছিল কড়ি।

সাত শতকের পরে স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে যায়। আট শতকে পালরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন করে রুপোর মুদ্রার চল হল, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরে এল না। রৌপ্যমুদ্রাতেও খাদ ক্রমে মিশল বেশ কিছু। তার পর সেন আমলে রৌপ্যমুদ্রাও উধাও হল। সর্বেসর্বা হল কড়ি। লক্ষ্মণসেনের নিম্নতম দান ছিল এক লাখ কড়ি।

কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নত বাঙলাদেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা উধাও হয়ে যাবার কোনো সন্তোষজনক কারণ জানা যায় না।

আট শতকের পর থেকে ব্যবসাবাণিজ্যে ঘটল অবনতি। শিল্পেরও সেই সঙ্গে পতন হতে থাকল। বিশেষ করে সামুদ্রিক বাণিজ্যের পতনের ফলে বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে। সেন আমলে বাঙলাদেশ 'পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল, অনড় গ্রাম্য-সমাজে পরিণত হল।'

বাঙলার এই অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তখনকার বাঙলা আজকের মতোই গ্রাম-প্রধান। নগর যে-কয়টি ছিল সেগুলির সঙ্গে আজকের শহরের চেয়ে কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামের মিলই বেশি। নগরে প্রধানত রাজা ও তাঁর পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বাস ছিল। আর নাগরিক ছিলেন বণিক-ব্যবসায়ীরা। নগরের সমাজ ও সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম্য-সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র। নাগর-সভ্যতা ও নাগর-নরনারীর হাবভাব, আদব-

কায়দা, চালচলন ছিল গ্রাম-বাঙলার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। আর তা যে কোনোদিনই সাধারণ মানুষের প্রীতির বস্তু হয় নি তার প্রমাণ বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। নগরে যখন ধনৈশ্বর্য ও বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য তখন বহু ক্ষেত্রেই গ্রাম-বাঙলা ছিল দীনহীন-দরিদ্র। গ্রাম-বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। তা কোনোরকমে দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানি-মাখা ছবি। আর নাগর-বাঙলায় তখন বিলাসিনীদের সভায় নাগর যুবকেরা বিলাসলীলায় মগ্ন।

কিন্তু এই বিশাল পার্থক্য সত্ত্বেও মোটের উপর প্রাচীন বাঙলার ধনসমৃদ্ধি নেহাত কম ছিল না। বিলাসের উপকরণ না জুটলেও ভাতকাপড়ের অভাব প্রাচীন বাঙলার কখনোই হয় নি। কারণ প্রজার অর্থনৈতিক দুর্গতি রাজা ও রাজ্যেরও দুর্গতি। সেজন্য প্রজার মঙ্গলবিধান ও উন্নতির দিকে এখনকার চেয়ে তখনকার রাষ্ট্রের নজর ছিল অনেক বেশি সতর্ক। তাই সেচব্যবস্থা, কৃষির ও শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি অনেক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির দায়িত্ব ছিল রাজার ও ভূস্বামীদের। সে দায়িত্ব পালনে তাঁরা ইংরেজসৃষ্ট জমিদারদের মতো পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

সামাজিক অবস্থা

বাঙলার প্রাচীনতম সমাজ ছিল কৌম-সমাজ। এই কৌম-সমাজ ছিল আর্যপূর্ব লোকেদের জিনিস। বৈদিক আর্যদের থেকে এরা স্বতন্ত্র। এদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি অনেকাংশেই আর্যসমাজ থেকে আলাদা ছিল। সম্পূর্ণ কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও যেটুকু জানা যায়, তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই অস্ট্রিক-ভাষীদের গোড়ার দিকে 'দস্যু', 'পাপ' ইত্যাদি বলে ঘৃণা করলেও তা বেশিদিন টেকে নি। বাঙলাদেশের আর্যীকরণের সূত্রপাত থেকেই এদের সঙ্গে আর্যভাষীদের মেলামেশা চলছিল। শত শত বছরের মিলন-বিরোধের ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে বাঙালী ও বাঙালী সমাজসংস্কৃতির প্রকৃতি ও রূপ রূপান্তর লাভ করছিল। এই সংঘাতের ফলে গুপ্তযুগের পর বাঙালী সংস্কৃতি ও সমাজে আর্যব্রাহ্মণ্য ছাপ গভীরভাবে পড়ে। কিন্তু আর্যপূর্ব সংস্কৃতি সমাজে বেশ বড় একটা অংশই দখল করে থাকে অনেকদিন—কখনো স্বরূপে কখনো রূপান্তরের ভিতর দিয়ে। বাঙালী সমাজের অন্দরমহলের নানা আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপে তার ছাপ আজও অম্লান। আজও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় নিম্নবর্ণের বাঙালী সমাজে—তাদের দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ভাবনা-কল্পনায়।

আর্যীকরণের সূত্র বেয়ে আস্তে আস্তে এইসব দস্যু ও ম্লেচ্ছ কোমেরা আর্য-সমাজব্যবস্থায় স্থান পেতে শুরু করে। এইসব

কোমের মধ্যে বর্তমান বিবাহ, আহার-বিহার এবং ধর্ম ও আচার-গত অনেক বিধিনিষেধ আশ্রয় করে পরে বাঙালী সমাজের বর্ণ-বিন্যাসের ও নানা বিধিনিষেধের ভিত গড়ে ওঠে।

আর্যভাষীরা বাঙলায় যখন আসেন সেই যুগে আর্যব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম সমাজ বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বারো-তেরো শতকে সেন আমলে। খুব কম বাঙালীই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা তখন আসছেন। স্থানীয় লোকেদের সাধারণভাবে পতিত ক্ষাত্রিয় ও শূদ্র বলে ধরা হত। তখন বর্ণাশ্রম অধ্যুষিত সমাজ কোনো চেহারা নিতে পারে নি, তখন শুধুই প্রাগার্যদের সঙ্গে আর্যদের মিলন আর বিরোধ।

গুপ্ত আমলে বর্ণ-ব্যবস্থার প্রসার হতে শুরু করে। পঞ্চম শতক থেকেই উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব বঙ্গে এবং পশ্চিম বাঙলায়ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম বেশ স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর পূজার্চনাও প্রচলিত হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যক্তি ও স্থানের সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে গ্রামে ও নগরে আর্যীকরণ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আর্যসমাজ আদিতে চারটি বর্ণে ভাগ করা হলেও পরে আর্য-প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভিন্ন মিশ্র বর্ণ বা জাতির উদ্‌ভব হয়। এগুলি হয় প্রধানত ভারতের অন্যান্য জাতি, উপজাতি ও কোমের জনগণকে আর্যব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার ভিতরে স্থান দেবার জন্য। এই সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নানা গালগল্পের অবতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আবার অমিলও অনেক। কারণ সেগুলি তাদের রচনাকালীন

দেশ ও কালের ভিত্তিতে লেখা। কিন্তু এইসব কাহিনীর পরে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের জাতিদের মধ্যেকার উঁচু-নিচু ভেদ সৃষ্টি হয়। সে বর্ণবিভাগের ভিত্তি ছিল বৃত্তি।

বাঙলার বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণ এবং অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ নিয়ে গঠিত। তিনটি দ্বিজবর্ণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের হদিশ প্রায় মেলে না বললেই চলে। অন্যান্যেরা বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে নানা শূদ্র উপবর্ণ গড়ে তুলেছিল।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল শর্মা ও স্বামী। তাছাড়া বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট প্রভৃতি 'গাঞি' পরিচয়ও ছিল। এই 'গাঞি' পরিচয়টা এসেছিল রাজা বা কোনো ব্যক্তি যে গ্রাম কোনো ব্রাহ্মণকে দান করলেন সেই গ্রামের নাম থেকে। এই সব 'গাঞি' উপাধি আজও চলতি। গাঞি বিভাগটা চালু হয় সেন-আমলে বারো-তেরো শতকে। আর আস্তে আস্তে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন উপবর্ণ বা শাখার উৎপত্তি ঘটে, যেমন, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও শাকদ্বীপী। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অবশ্য বিদেশাগত। ছয়-সাত শতকে বাঙলার নানা স্থানে ব্রাহ্মণেরা ছড়িয়ে পড়লেও পরের শতকে তাঁদের আগমনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এবং বারো-তেরো শতকেও বিদেশাগত ব্রাহ্মণদের উল্লেখ নানা লিপিতে পাওয়া যায়।

বল্লালসেনের আমলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী দুটির উদ্ভব হয় এবং কৌলীন্যপ্রথার চল হয়। মাঝে মাঝে অদলবদল হয়ে পনেরো শতকে কৌলীন্যপ্রথা যে সুনির্দিষ্ট ও সংহত রূপ নেয় তা আজও বর্তমান।

বাঙলার বৈদিক ব্রাহ্মণেরা একটি মতানুসারে গৌড়রাজ শ্যামল-বর্মার আমন্ত্রণে আসেন। কারণ বাঙালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ জানতেন না। আরেক মতে তাঁরা যবনদের আগমনের কথা জ্যোতিষ গণনায় জানতে পেরে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় রাজা হরিবর্মার ছত্রতলে আশ্রয় নেন। বৈদিকদের মধ্যে দুটি বিভাগ আছে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য।

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের খবর এই যুগেই পাওয়া যায়। দেবল বা শাকদ্বীপী ও গ্রহবিপ্র বা গণক। ব্রাহ্মণ সমাজে এঁদের কোনো মর্যাদা ছিল না। গণকেরা তো পতিত বলে গণ্য হতেন। এঁদেরই একটি শাখা 'অগ্রদানী' নামে পরিচিত। এ ছাড়া নিম্নশ্রেণীদের আলাদা যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষিকাজে বা যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি করা হত না। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিত্র ও বিভিন্ন কলাচর্চা ও বৃত্তি ছিল নিষিদ্ধ।

বাঙলাদেশের সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চাদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকেই যে ব্রাহ্মণোচিত কাজকর্ম করতেন না তাও নিশ্চিত। উঁচু-নিচু অনেক রকম কাজই তাঁরা করেছেন। দর্ভপাণি ও ভবদেবভট্ট বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রিত্ব করেছিলেন। সমতটে ব্রাহ্মণবংশীয় রাজাও ছিলেন। জাতিভেদের কুফল ও সমাজের অধঃপতন যে কতদূর পৌঁছেছিল তা ব্রাহ্মণদের পতিত করার বিধান থেকে জানা যায়। শূদ্রকে জ্ঞানদান ও যাজন করলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, শূদ্রাণী বিয়ে করলে পতিত হতে হত, অথচ শূদ্রাণী-সহবাস করলে ব্রাহ্মণের তেমন কোনো অপরাধ হত না। এমনকি কোনো টীকাকারের

মতে শূদ্রাণী বিয়ে করা যত না বড় অপরাধ তার চেয়ে অনেক সামান্য অপরাধ হচ্ছে পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। আইনসঙ্গত (?) নৈতিক অবনতির এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী ?

ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার অপর সমস্ত বর্ণই সংকর শূদ্র বর্ণ হিসাবে ধরা হয়। এদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের প্রত্যেকের স্থান ও বৃত্তি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ঠিক করা হয়। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর উপবর্ণদের পূজানুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করতে পারতেন। এই ভেদের সঙ্গে জল-আচরণীয়তার বিধিনিষেধও আরোপিত হয়। বাঙালী সমাজ আরও বেশি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়।

গোড়ায় বর্ণের সংখ্যা ছিল খুব সম্ভবত ছত্রিশ। সেই থেকে বাঙলায় 'ছত্রিশ জাত' কথাটার উৎপত্তি। এই জাতবিভাগ আজও চলতি ও মোটের উপর বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মেলে। পরে অবশ্য এর সংখ্যা বেড়ে যায় ও কয়েকটি কোমের নাম যোগ হয়।

ব্রাহ্মণদের পরেই বাঙলা সমাজে প্রাধান্য ছিল করণদের। করণেরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথমে করণ অর্থে বোধহয় জাত বোঝাত না। পরে করণ ও কায়স্থ একার্থক ছিল। কায়স্থ অর্থে প্রথমে একশ্রেণীর রাজকর্মচারী বোঝাত। যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় যে এই বৃত্তিবাচক শব্দদুটি দশম শতাব্দীর পর একটি সংকর বর্ণকেই বোঝাত। অর্থাৎ করণ ও কায়স্থ মিলে গিয়ে এক জাতে পরিণত হয়েছে।

বৈদ্য বলতে প্রথমে শুধু চিকিৎসক বোঝাত। পরে তা জাতি-বাচক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। ঠিক কোন্ সময় এই জাতের প্রতিষ্ঠা বলা যায় না। এঁরা রাজ্যে ও সমাজে উঁচু মর্যাদার অধিকারী

ছিলেন। কিন্তু বারো শতকের আগে বাঙলায় বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। অম্বষ্ঠ নামে চিকিৎসাবৃত্তিধারী আর-এক জাতের নাম আমরা পাই। মধ্যযুগে বৈদ্য-অম্বষ্ঠ একার্থক হয়ে যায়। এবং বোধহয় কায়স্থ-করণের মতোই এ দুটিও পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়।

এ-ছাড়া বাঙলার অন্যান্য জাত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বৈশ্যবৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু তার পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কমতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাও কমে যায়। এমনকি বল্লালের আমলে অনেকেই সৎশূদ্র পর্যায় থেকেও নিচে নেমে যান। কৈবর্তদের রাজ্যে ও সমাজে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বলে মনে হয়। সে-প্রভাব অনেকদিন টিকে ছিল। আর কোনো বর্ণের রাষ্ট্রে বা সমাজে কোনো প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না।

কিন্তু একই বৃত্তিধারী ব্যক্তিরা অনেক সময় বিভিন্ন জাতে বিভক্ত ছিলেন। তেমনি আবার বিভিন্ন জাতের লোকেরা একই বৃত্তিধারী ছিলেন। যেমন কৈবর্ত ও মাহিষ্য এবং ধীবর বা জেলে। অন্যান্য যে-সব নীচজাতের পরিচয় প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় তারা আজও সুপরিচিত। যেমন চণ্ডাল, চর্মকার, মল্ল প্রভৃতি।

প্রাচীন 'চর্যাপদ' গ্রন্থে ডোম, চণ্ডাল ও শবরদের কিছু কিছু বিবরণ আছে। ডোমরা নগরের বাইরে বাস করত ও অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হত। তারা বাঁশের ঝুড়ি বানাত ও তাঁত বুনত। ডোম মেয়েদের স্বভাবচরিত্র ছিল সন্দেহের বিষয়, আর তারা নেচে-গেয়ে বেড়াত। শবরেরা থাকত পাহাড়ে। শবরীরা কানে দুল ও ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাফলের মালা পরত। এইসব অন্ত্যজ জাতগুলি

বোধহয় বাঙলার আদিমতম অধিবাসীদের বংশধর। আর্যব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের ছত্রতলে ঠাঁই মিললেও সম্মান এদের কোনোদিনই মেলেনি।

ধর্মকর্ম-পালপার্বণ॥ বাঙলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই আর্যব্রাহ্মণ্য ধারণার দান। কিন্তু এরই পাশে আজও বহু স্থানীয় লৌকিক দেবদেবী, গাছপাথর, বাঙালীরা পুজো করে আসছে। এইসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা অব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস, বিস্ময় ও ভয়ভাবনা। আজকে আর এগুলিকে সহসা আলাদা করা যায় না। কিন্তু একটুখানি খুঁটিয়ে দেখলেই আমরা তার অব্রাহ্মণ্য স্বরূপ বুঝতে পারি। এইসব নানা গাছপাথর, গ্রামদেবতা প্রভৃতির পূজা বাঙলার আদিমতম অধিবাসীদের দান। তাদের এইসব ধ্যানধারণা আর্যব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণার সঙ্গে মিলেমিশে বর্তমান বাঙালীর মানসধর্মের রূপ দান করেছে। বিভিন্ন গ্রামদেবতারা—যেমন ভৈরব বা ভৈরবী, বনদুর্গা বা চণ্ডী, অথবা অন্য কোনো নামধারী—বাঙলার গ্রামে গ্রামে তাঁদের নিজস্ব স্থান বা 'থান' জুড়ে বিরাজমান। এঁরা প্রাগার্য চিন্তায় গ্রামবাসীদের ভয়ভক্তির দেবদেবী, তাই গ্রামের বাইরেই তাঁদের আসন। ব্রাহ্মণ্য-বিধান-বহির্ভূত এইসব দেবতার পূজা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পুজো করার ফল পতিত হওয়া। তবু কোনো বিধিনিষেধই এঁদের পুজো কোনোদিন বন্ধ করতে পারে নি। বরং এঁদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃত হয়েছেন, যেমন শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, বনদুর্গা, নানারূপের চণ্ডী, বিভিন্ন কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি।

সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতিরা এখনো পূর্বপুরুষদের মতোই গাছ-

পাথর-পশু-পাখি-ফলফুলকে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখে তার পুজো করছে চিরাচরিত ধারণা অনুসারে। এরা শুধুই গাছ-পশু-পাখি নয়। আদিম মানুষের ধারণা অনুযায়ী এরা একএকটি কোমের দেবতা বা প্রতিষ্ঠাতৃপুরুষ। এদের পুজো তাই কৌমদেবতার পুজো। বাঙলায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, মেয়েদের মধ্যে আজও গাছপুজো প্রচলিত। অনেক পুজোয়, ব্রত-উৎসবে গাছের ডাল পুঁতে দেবতার সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছেরও পুজো করা হয়। আম্রপল্লব, ধানের ছড়া, দূর্বাঘাস প্রভৃতি নানা শুভকাজে ও পুজোয় লাগে। কলা-বৌএর পুজো না করে দুর্গাপুজো কি হয় ?

ঠিক এমনি কৌম প্রভাব ছিল নানা ধ্বজাপুজোর মধ্যে। প্রাচীন ভারতে গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজ, ময়ূরধ্বজা প্রভৃতি পুজো ও উৎসব প্রচলিত ছিল। বাঙলাদেশেও তা চালু ছিল। 'একেক কোম বা গোষ্ঠীর একেক পশু বা পক্ষী আঁকা ধ্বজা, সেই ধ্বজার পুজোই সেই গোষ্ঠীর বিশেষ কোমগত পুজো। যে কোমের যিনি নায়ক, সেই কোমের ধ্বজা অনুযায়ী কারো নাম তাম্রধ্বজ, কারো নাম ময়ূরধ্বজ কারো নাম হংসধ্বজ। যেসব আদিম পশুপাখির চিহ্ন নিয়ে এইসব ধ্বজা তৈরি হয়েছে, পরে অনেক ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় তার ছাপ না পড়ে পারে নি; যেমন দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন ষাঁড়, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, সরস্বতীর বাহন হাঁস, গঙ্গার বাহন মকর···। দেবদেবীর পুজোর সঙ্গে এইসব পশুপক্ষী-চিহ্নিত পতাকার পুজো অনেকদিন থেকে চলে আসছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম আর বাঙলার নিচু জাতের লোকদের মধ্যে কোনো ধর্মকর্মই ধ্বজা আর ধ্বজাপুজো ছাড়া হয় না বললেই চলে।'

'এছাড়া আছে চাষ্-আবাদের সঙ্গে জড়ানো নানা দেবদেবীর পুজো। জমিতে প্রথম লাঙল দেবার, বীজ ছড়াবার আর শালিধান বুনবার, ফসল কাটার আর ফসল তোলার নানা অনুষ্ঠান। আছে নবান্ন, নতুন গাছ কিম্বা নতুন ঋতুর প্রথম ফল আর ফসলকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব।' আখমাড়াই ঘরের দেবতা পণ্ডাসুর আজও 'পরাসর' নামে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে পুজো পান।

'বাঙলার আদিবাসী কোমদের অন্যতম প্রধান উৎসব হল যাত্রা। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আসলে এই আদিবাসীদেরই দান।' এগুলি উচ্চকোটির সমাজে অপ্রিয় হলেও অশোক প্রমুখ রাজাদের নিষেধ অবহেলা করে আজও টিকে আছে, আর ব্রাহ্মণ্য সমাজেও তা স্বীকৃত হয়েছে।

বাঙালীর জীবনে একটা বেশ বড় স্থান জুড়ে আছে ব্রত। প্রাগার্য কাল থেকেই এই ধর্মোৎসব চলে আসছে। প্রধানত মেয়েরা এইসব ব্রতের অনুষ্ঠাতা। ব্রাহ্মণ্য সমাজে এইসব ব্রত স্বীকৃতি না পেলেও আর্যপূর্ব ও অন্-আর্য নরনারীরা আর্যব্রাহ্মণ্য সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকবার পরে এই সব ব্রতও আস্তে আস্তে স্বীকৃতি আদায় করে।

এই ধরনের আরও অনেক ধর্মানুষ্ঠান বাঙলার জীবনে প্রচলিত আছে যেগুলি অবৈদিক, অস্মার্ত। এগুলি বাঙালীর প্রাগার্য জীবনের দান। যেমন—ধর্মপূজা, চড়ক, অম্বুবাচী, জাঙ্গুলীদেবীর পূজা, হোলি, ঘটলক্ষ্মীপূজা। এগুলি ও অন্যান্য যে-সমস্ত বেদস্মৃতি-বহির্ভূত অনুষ্ঠান বাঙালীর জীবনে আছে সবই আদিবাসী কৌম সমাজের দান। 'মঙ্গলানুষ্ঠানের শুরুতে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁদের পুজো করবার ব্যাপারটাও' আর্যপূর্ব

ধারণা। 'বাঙলাদেশের বিয়েতে হোম, সম্প্রদান আর সপ্তপদী ছাড়া স্ত্রীআচার, লোকাচার ইত্যাদি সব কিছুই মূলত কৌমসমাজের দান।

এই প্রাগার্য ধ্যানধারণার উপর আর্যপ্রভাব শুরু হয় জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ—আর্যধর্মাশ্রয়ী কিন্তু বেদবিরোধী এই ধর্মগুলির মারফত। গুপ্ত আমলের অনেক আগেই জৈন-বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে বেশ বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম পরে বাঙালীর ধর্মজীবন থেকে হঠে গেলেও তার প্রভাব কিন্তু সুদৃঢ়ভাবে রেখে যায় নানান তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে। সহজযান, বজ্রযান, হীনযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধারণা স্ব-রূপে বা গোপনে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে বাঙালীর ধর্মজীবনে। তারপর আসে আর্যব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিজয়রথ অনুসরণ করে। রাজানুকুল্যে ও ব্রাহ্মণাদি আর্যভাষীদের আসার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা বাড়তে শুরু করে। বর্ণাশ্রম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর আর্যব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি আদিবাসী ধ্যানধারণাকে সরিয়ে বা আত্মসাৎ করে নিজের আসন পাকা করে নেয়। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বাঙলার ধর্মজীবনে প্রধান স্থান অধিকার করে। আর্যপূর্ব ও বেদবিরোধী ধর্মগুলি ক্রমেই রাজার ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। বর্তমান বাঙালী সমাজে আমরা যেসব হিন্দু দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাই গুপ্ত-আমল থেকেই এদেশে তাঁদের পূজা বিস্তার হয়েছে। তখনও যেমন আজও তেমনি বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম বাঙলার ধর্মজীবনে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তখনকার মতোই আজও বাঙলায় পুরুষ-দেবতার চেয়ে স্ত্রীদেবতারই প্রাধান্য। বাঙালীর জীবনের মতো বাঙালীর মানস-সংস্কৃতিও সমন্বিত হয়ে এক নতুন রূপ নিয়েছে।

বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের পট তুলে যেতে থাকলে একের পর এক কত বিভিন্ন বিচিত্র দৃশ্যই না চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। প্রথম দেখা যায় সেই সব আদিবাসীদের মুখ যারা সর্বপ্রথম নদীমেখলা পলিমাটির এই উর্বর ভূমির টানে প্রথম মাটির বুক চিরে আবাদ শুরু করে মানুষের বসতি স্থাপন করে। তারপর এক-এক করে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, বিভিন্ন কোম তাদের বিচিত্র ধ্যানধারণা, জীবনাদর্শ ও সমাজ নিয়ে বাঙলায় আসে। সবাই এসে প্রেমে পড়ে যায় এই পলিমাটির দেশ বাঙলার। আদিবাসী প্রাগার্য ও আর্য নরনারীর মিলনের মাঝ দিয়ে জন্ম নেয় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি। সে বাঙালী কোনো বিশেষ নরগোষ্ঠী নয়, কোনো বিশেষ মানসসংস্কৃতিও তার নেই। তার মধ্যে সবই আছে, নেই শুধু কোনো এককের ছাপ। সবকিছু এসেছে, এসে মিলে-মিশে গেছে বাঙলার মাটিতে। আর তার ভিতর থেকে রূপ পরিগ্রহ করেছে বাঙালী জাতি (নেশন), বাঙালী সংস্কৃতি। সে এককরূপে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে এক।

কিন্তু বহুর মিলনক্ষেত্র এই বাঙলাও একদিক থেকে সংকীর্ণতা পরিহার করতে পারে নি। সেই সংকীর্ণতা কৃষিনির্ভরতার দান। মাটির অনড় অচল টানে প্রাচীন বাঙালী বাঁধা। মাঝখানের কয়েক শো বছর (২য়-৩য় থেকে ৬ষ্ঠ-৭ম শতক) বাদ দিলে চাষবাস আর জমিজমাই বাঙালীর প্রধান নির্ভর। সেইজন্যে বাঙালীর

জীবনের ছোট গণ্ডি ভেঙে গিয়ে বৃহত্তরের ভাবনা আসে নি। বাঙলার ভিতরেও বিভিন্ন কোম-অধ্যুষিত অঞ্চল আশ্রয় করে স্বাতন্ত্র্যের এক চেতনা ছিল। মাঝে মাঝে সারা বাঙলা এক হলেও তারা সব সময়েই স্থানীয় জনপদ হিসাবে বা পরে বিভিন্ন সামন্তদের অধীনে নিজেদের আবার সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আচ্ছন্ন করেছে।

তার উপর ছিল বর্ণাশ্রম সমাজগত ও শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতা। বর্ণ-ভেদের, শ্রেণীভেদের ভিতর দিয়ে প্রাগার্য কৌম-সমাজের স্বাভাবিকতা ভেঙে দিয়ে সমাজের ভিতরেই বিভেদের পালা শুরু হয় গুপ্ত-আমল থেকেই। বর্ণ আর বৃত্তির এই নিগড় ঠেলে ফেলার সাধ্য কারো ছিল না। আর জন্মগত বিভেদ বাঙলার শ্রেণীবিভাগেও কাজ করেছে। কিছুটা সেইজন্যেও প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীও অনড় অচল হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থবোধ যেখানে শ্রেণী-বিরোধ আনতে পারত, বর্ণাশ্রমের কঠিন শাসন সেখানে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে কোনো শ্রেণী সামাজিক ধনোৎপাদনের দ্বারা রাষ্ট্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা বাড়াতে পারলেও সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে নি, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও এগোতে পারে নি। ভূমিনির্ভর বাঙলা-দেশ অনড় অটল থেকে বর্ণভেদভিত্তিক সমাজ ও ধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছে। বাঙালীর জীবনের আর সমাজের ভিত প্রাচীন-কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একই রকম থেকে গেল।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যচেতনা মোটেই অবলুপ্ত হল না। বারে বারে সে নিজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। শশাঙ্ক এই স্বাতন্ত্র্যচেতনার প্রথম ধ্বজাবাহী। পাল আমলে তার পূর্ণতা। সেই সময়ে বাঙলা ছাড়িয়ে বৃহৎ বঙ্গের কথাও শোনা যায়।

পাল আমলের পরে সে চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে আঞ্চলিক চেতনা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙলাদেশ রাষ্ট্রীয় সত্তার আদর্শ ভোলে নি। নানা বাধা-বিঘ্ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বার বার সে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবার চেষ্টা করেছে তার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে। আর্যীকরণ সত্ত্বেও বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ কোনোদিনই লোপ পায় নি। আর্য-প্রভাব সারা বাঙালী সমাজের সর্বত্র কোনোসময়েই ঢুকতে পারে নি। মহাভারতের আদর্শ মেনে চললেও সে চিরদিনই আপন সত্তা বজায় রেখে মহাভারতের অংশ হয়ে থাকতে চেয়েছে।

পাল আমলে সারা বাঙলাদেশ এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হওয়ায় এই আদর্শ পুষ্টিলাভ করে। সুদীর্ঘ চারশো বছর ও মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি একটি রাজ্য হিসাবে বাঙালী-বোধও বিস্তার পায়। এই সময়েই বাঙলা ভাষারও সূত্রপাত। এক ভাষা ও এক রাজ্যের ফলে বাঙালীর জাতিচেতনা পুষ্টিলাভ করে। বাঙালী তখন গৌড়-বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ়ের ভেদ ভুলে বাঙালী হতে শুরু করে। কিন্তু সে বোধ তখন পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। সে বোধ তখন অঙ্কুরমাত্র। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণেও তার পরিণতি আরও বহুদিন পিছিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হল না। হিন্দুযুগের শেষ ভাগ তাই বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষের কাল।

মধ্যযুগ

বখ্‌তিয়ারের বাঙলাবিজয়

বখ্‌তিয়ার খিলজির বাঙলাবিজয় বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা করল। ইতিহাসের এই পর্ব মুসলমান যুগ বা মধ্যযুগ নামে পরিচিত। এই পর্বান্তর বাঙলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন ধর্মাবলম্বী জনগণের রাজনৈতিক আধিপত্যের যুগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম বিদেশাগত বিধর্মী লোকেরা ভারতে এসে নিজেদের সত্তা খুইয়ে ফেলল না, ভারতের জনপ্রবাহে মিশে গেল না, লোপ পেল না তার নিজস্ব ধর্মের। ইসলাম ধর্ম যে বিজয়-অভিযানে বেরিয়েছিল আপন শক্তির বিস্তারে তারই ধ্বজাবাহক হয়ে ভারতের ইতিহাসে তুর্কি-পাঠান প্রভৃতির এদেশে আগমন। উদ্দেশ্য অবশ্য শুধু রাজ্যবিস্তার বা ধর্মবিস্তার ছিল না। প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন। অভারতীয়দের কাছে ভারতবর্ষ সুবিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডারের ভাগ বসাবার জন্যেই ভারতে প্রথম মুসলমান অভিযানের শুরু। কিন্তু পরে ভারতের হিন্দুরাজাদের দলাদলি, একতাহীনতা ও পূর্বের তুলনায় নির্বীর্যতার সুযোগ নিল মুসলমান অভিযানকারীরা। লুঠেরা রূপান্তর গ্রহণ করল সুলতানরূপে।

বখ্‌তিয়ার খিলজিও এইরকম এক ভাগ্যান্বেষী ছিলেন। তুর্কি বা তুর্কোমান কোমের সন্তান তিনি। ভাগ্য ফেরাবার জন্যে আসেন হিন্দুস্থানে। এসে স্থাপন করলেন এক প্রায়-স্বাধীন বাঙলা রাজ্য।

মালিক ইখ্‌তিয়ারউদ্‌দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জয় করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গিয়ে পূর্ব বাঙলায় সেন-বংশের স্তিমিত দীপশিখা কোনোরকমে জ্বালিয়ে রাখেন। বখ্‌তিয়ার অবশ্য সেন রাজাকে অনুসরণ করলেন না। নদীয়া লুণ্ঠন করে তিনি গৌড়ের দিকে এগোলেন। গৌড় দখল করবার পর বখ্‌তিয়ার বাঙলা ও বিহারের অধিপতি হয়ে বসলেন (১২০৩ খ্রীঃ)। পরবর্তী দু বছর তিনি রাজ্যের শান্তিপূর্ণ শাসন পরিচালনায় নিয়োগ করেন। সাধারণভাবে তিনি মুসলমান-বিজেতাদের চিরাচরিত পন্থানুসরণ করেন হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে এবং তার ভিত্তির উপর মসজিদ তৈরি করে। মুসলিম চিন্তার প্রসারের জন্য তিনি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং কাফেরদের ধর্মান্তরিত করেন। কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না এবং প্রজাহত্যা বা প্রজাদের উপর অত্যাচার তিনি বিশেষ করতেন না। আভ্যন্তরিক শাসন সমস্যার সমাধান ও সেনানায়কদের মনস্তুষ্টি বিধান তিনি করেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

চার বছর পরে বখ্‌তিয়ার তিব্বত অভিযানের সংকল্প করেন। ঠিক কেন তিনি তিব্বত জয় করতে চেয়েছিলেন তা জানা যায় না। এবং তিব্বত অভিযান নানা দিক থেকে খুব যে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তা-ও নয়। বখ্‌তিয়ারের রাজ্যের পশ্চিম দিকে মিথিলার হিন্দুরাজা তখনো স্বাধীন নৃপতি, পূর্বে করতোয়া নদীর ওপারে স্বাধীন কামরূপ-রাজ্য ও পূর্ববঙ্গে সেন রাজারা আর দক্ষিণে রাঢ় সম্পূর্ণ বিজিত হয় নি, আর আছে উড়িষ্যার পরাক্রান্ত পূর্ব-গঙ্গ রাজারা। যাই হোক, তিব্বত অভিযান বখ্‌তিয়ারের জীবনের চূড়ান্ত কীর্তি। বাঙলা ও তিব্বতের মধ্যবর্তী তরাই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ধর্মান্তরিত

এক মেচ দলপতির সাহায্যে তিনি অভিযান শুরু করেন। কিন্তু তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। হতাশ হয়ে ফেরবার সময় বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি ও কামরূপরাজের বিরোধিতার ফলে বখ্‌তিয়ার অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েন। খাবারের অভাবে তাঁর সেনাদল ধ্বংস হতে থাকে। অবশেষে মাত্র একশো সৈন্য নিয়ে বখ্‌তিয়ার দেবকোটে ফিরে আসেন।

এই ব্যর্থতার ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। বাঙলার হিন্দুরাজারা হাঁপ ছাড়ার সময় পেলেন ও তাঁদের রাজ্যের আয়ুষ্কালও বেড়ে গেল। এত বেশি সৈন্যধ্বংসের ফলে গৌড়ের মুসলমান অধিপতিদের ক্ষমতা-বিস্তারে ভাঁটা আসে। আর বিহার বাঙলার হাতছাড়া হয়ে যায়। খিল্‌জিরা হতাশ্বাস হয়ে পড়ে। বখ্‌তিয়ারকে ভাগ্যদেবী ত্যাগ করায় বিশ্বাসঘাতকা ও বিভেদের বন্যা দেশে বয়ে যায়। লজ্জায় ও অনুতাপে বখ্‌তিয়ার বাইরে বিশেষ বেরুতেন না। বোধ হয় নিহত হবার ভয়ও তাঁর মনে জেগেছিল। যখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও জীবনমরণের সন্ধিস্থলে তখন ১২০৬ সালে আলি মর্দান খিল্‌জির হাতে তিনি নিহত হন। ঠিক ঐ সময়েই মহারাজা লক্ষ্মণসেনও গতাসু হন তাঁর নদীবেষ্টিত রাজধানী বিক্রমপুরে। নদীয়াধ্বংসের পর যে-কয়বছর তিনি বেঁচেছিলেন, সেই কবছর এই ধার্মিক ও পণ্ডিত রাজা তলোয়ারের বদলে লেখনী সঞ্চালনের দ্বারা যশবৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মালিক ইখ্‌তিয়ারউদ্‌দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার সত্যই বাঙলার মধ্যযুগের ইতিহাস-প্রণেতা। যে-সময় দাস-বাজার থেকে মসনদে বসা ছিল বেশ সাধারণ ব্যাপার সেই সময়ে তিনি কীর্তিমান হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য মুসলমান নায়কদের থেকে তিনি একটু

আলাদা ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি জন্মেছিলেন স্বাধীন মানুষ হিসেবে, তিনি বেঁচে ছিলেন ও মরেও ছিলেন স্বাধীন মানুষ হিসেবেই। একমাত্র নিজের চেষ্টাতেই তিনি একজন ভাগ্যান্বেষী থেকে সুলতান হয়েছিলেন। সবার উপরে তিনি ছিলেন সেনানায়ক। সাধারণ লোকের ঘরে জন্মালেও, বিকলাঙ্গদেহ হলেও তিনি সত্যিই নেতা ছিলেন। যেমনি দুঃসাহসী তেমনই উদারচেতা। তাঁর দুর্বলতাগুলি বেশি আত্মবিশ্বাস ও নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের ফল।

বখ্‌তিয়ার-প্রতিষ্ঠিত লখ্‌নাবতি রাজ্যের সীমানা সঠিক জানা যায় না। তাঁর আমলের কোনো মুদ্রাও পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে লখ্‌নাবতির সীমারেখা মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে—উত্তরে বর্তমান পূর্ণিয়া শহর থেকে উত্তর-পুব-মুখী একটা সরল রেখা টেনে দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত ; পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী ; দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে কোশি নদীর নিচের দিক ও কোশি-গঙ্গাসঙ্গম থেকে রাজমহল পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত। এই সীমার ভিতরে বখ্‌তিয়ারের ক্ষমতা ছিল সুদৃঢ়। সরকার লখ্‌নাবতি ছাড়াও তাঁর অধিকারে ছিল বাঙলার আর ছয়টি সরকারের মহালগুলির অধিকাংশ—টাণ্ডা, পূর্ণিয়া, পিঞ্জরা, তাজপুর, ঘোড়াঘাট এবং বরবকাবাদ।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের সময়ে এবং তাঁর পরেও বহুদিন পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থা চালু ছিল তা ছিল একধরনের কৌম-সামন্ততন্ত্র। দেশের অধিকাংশ স্থান সেনানায়কদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। এঁরা ছিলেন প্রধানত তুর্কি ও খিল্‌জি। যেসব বিভিন্ন ভাগ্যান্বেষীরা বখ্‌তিয়ারের দলে আশ্রয় নিয়েছিল তারা সবাই তাদের নতুন দেশে বেশ ভালোভাবেই কায়েম হয়ে বসল। সীমান্ত অঞ্চলে বখ্‌তিয়ার

কতকগুলি শক্তিশালী শাসনবিভাগের সৃষ্টি করেন ও সেগুলির পরিচালনভার তাঁর প্রধান সেনাপতিদের দেন, যেমন আলি মরদান, হুসামউদ্‌দিন ইবাজ ও মহম্মদ শিরান। এঁরা প্রত্যেকেই খিল্‌জি। ফলে লখ্‌নাবতির মুসলমানরাজ্যটি খিল্‌জি-চরিত্র ধারণ করল এবং এর পরবর্তী ইতিহাসকে রূপদান করল। কিন্তু বখ্‌তিয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল লখ্‌নাবতির মুসলমানরাজ্য আর তার স্বাধীন সূত্রপাত ও বিকাশের ঐতিহ্য। স্বাধীনতার এই ঐতিহ্য পরে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের রাজ্যে বিকশিত হয়।

বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পরে বাঙলার মুসলমান নায়কদের ভিতরে গৃহবিবাদ শুরু হল। এই গৃহবিবাদের সমাপ্তি ঘটল ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে আলি মরদানের মৃত্যুতে। এই সময়ের ও পরবর্তী বহু-দিনের বাঙলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেনরাজাদের অবলুপ্তির পর বাঙলার ইতিহাসের উপর এক কালো পরদা নেমে আসে। তার মধ্যে আলো ফেলা কষ্টকর ব্যাপার। তার অন্যতম কারণ মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসের উপর আধুনিক গবেষণার একান্ত অভাব। শুধুমাত্র কয়েকটি যুগ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু তথ্য জানা যায়। তা ছাড়া সেই একই কুয়াশাচ্ছন্ন লোকস্মৃতি ও ধর্মীয় মনোবৃত্তির বেড়াজাল। এমনকি গোড়ার দিকের মুসলমান রাজাদের কালানুক্রমও অনিশ্চিত। তার কারণ, মুদ্রার স্বল্পতা আর সেগুলি এত খারাপভাবে তৈরি যে তারিখগুলির ঠিকমতো পাঠোদ্ধার দুরূহ। আর মুসলমানদের লেখা অধিকাংশ ইতিহাসই ঘটনাকালের অনেক পরে লেখা বলে নানা অসঙ্গতি ও উপকথায় ভরতি। তবুও এই সবের ভিতর থেকেও বাঙলার মধ্যযুগের

ইতিহাসের একটা ছবি আঁকা হয়েছে। তা মোটামুটি সঠিকও, আর সেইটেই আমাদের আলোচনার বিষয়।

*

বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর অনুচরদের ভিতরে যে-গৃহবিবাদ শুরু হল তা মোটামুটি ১২১২ সালে শেষ হল। এই গৃহবিবাদের প্রধান নায়ক ছিলেন আলি মরদান। প্রথম দিকে মহম্মদ শিরান খিল্‌জি সিংহাসনে বসেন। আলি মরদান পশ্চিমে পালিয়ে যান। পরে সুলতান কুত্‌বুদিন আইবকের সাহায্যে অনেক সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে বাঙলায় ফিরে আসেন ১২১০ সালে। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও নৃশংস ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। বিপক্ষীয়দের তিনি নির্মমভাবে দমন করেন। বখ্‌তিয়ার ও মহম্মদ শিরান কাজে স্বাধীন হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নি। আলি মরদানই প্রথম নিজেকে সুলতান আলাউদদিন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে নিপীড়িতদের দ্বেষ ধূমায়িত হতে থাকে। তার উপর আবার বহুদিন বাঙলানিবাসী খিল্‌জি নায়কগণ ও মরদানের সহচরদের মধ্যেও বিরোধ বেড়ে ওঠে। অবশেষে হুসাম্‌উদ্‌দিন ইবাজ-এর নেতৃত্বে খিল্‌জিরা সুলতান আলাউদ্‌দিনকে হত্যা করে ইবাজকে সিংহাসনে বসায়।

সুলতান গিয়াস্‌উদ্‌দিন ইবাজ খিল্‌জি নিজের ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার ফলে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে বাঙলার মসনদে বসেন। তিনি লখ্‌নাবতির খিল্‌জি বিদ্রোহীদের নায়ক হলেও গৌড়ের জনপ্রিয় সুলতানদের ভিতরে একজন। তাঁর আমলেই

মুসলমানেরা বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলেও নিজেদের অধিকার কায়েম করতে সচেষ্ট হন। এর ফলে গিয়াস্‌উদ্‌দিন বিভিন্ন হিন্দু রাজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন গঙ্গ সম্রাট তৃতীয় অনঙ্গভীমের অন্যতম মন্ত্রী বিষ্ণু। এছাড়াও পশ্চিমের তিরহুতরাজ এবং কামরূপরাজ ও বঙ্গাধিপতির সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। পূর্ব বাঙলায় সেনরাজা বিশ্বরূপসেন যে নতি-স্বীকার করেন নি তা নিঃসন্দেহ।

যাই হোক, গিয়াস্‌উদ্‌দিন ইবাজ যে সারা বাঙলার শাসক হবার চেষ্টা করেন তার প্রমাণ দেবকোট থেকে গৌড়ে রাজধানী সরানো। এই গৌড়কে কেন্দ্র করেই পূর্বভারতের উপর আধিপত্যের স্মৃতি পালরাজাদের আমল থেকে বাঙলার লোকস্মৃতিতে জাগরূক। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান আমলের বহুবিখ্যাত গৌড় তার সমস্ত সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য নিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। যেটুকু ধ্বংসাবশেষ আছে তাও জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।

গিয়াস্‌উদ্‌দিনের শাসনকালের বারো বছর বাঙলাদেশ প্রায় শান্তিতেই বাস করেছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্র হিসেবে মুসলমানজগতে খ্যাতিলাভ করেছিল। ১২২৫ সালে দিল্লীর সুলতান শামসুদ্‌দিন ইল্‌তুত্‌মিশ বাঙলা অভিযানে আসেন। কিন্তু যুদ্ধ হবার বদলে দুই পক্ষই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইল্‌-তুত্‌মিশ দিল্লী ফেরামাত্রই ইবাজ সন্ধির শর্ত ভাঙেন। ইল্‌তুত্‌-মিশ চুপ করে রইলেন। কারণ ইবাজকে যে সহজে পরাজিত করা যাবে না তা তিনি বুঝেছিলেন। কিছুদিন বাদে দিল্লীর যুবরাজ নাসিরুদ্‌দিন মাহ্‌মুদ অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। ১২১৪

সালে ইবাজ বঙ্গ অভিযানে তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে যান। এই ফাঁকে নাসিরুদ্‌দিন গৌড় অধিকার করেন। ইবাজ খবর পেয়েই কিছু সৈন্য নিয়ে ফিরে আসেন এবং সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন (১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুলতান গিয়াস্‌উদ্‌দিন ইবাজের মৃত্যুকালে লখ্‌নাবতির সীমা নিরূপণ করা কঠিন। খাস বাঙলায় ইবাজের রাজ্য ছিল এই কয়টি সরকারে বিভক্ত—লখ্‌নাবতি, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জরা, ঘোড়াঘাট, বরবকাবাদ; বজ্‌হার (রাজসাহী-বগুড়ার অংশ) পশ্চিমাংশ; টাণ্ডা, শরিফাবাদ (নগর-বীরভূম) ও সুলেমানাবাদ (বর্ধমান)। দক্ষিণ বিহার জয় করে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা অযোধ্যাপ্রদেশের সন্নিকটে গণ্ডক নদীর মুখ পর্যন্ত প্রসারিত করে-ছিলেন। আসলে এর অধিকাংশ জায়গাতেই তাঁর আধিপত্য ছিল সামরিক দখলের মতো। বখ্‌তিয়ারের আমলের মতো লখ্‌নাবতির চারপাশেই সারা দেশ জুড়ে শক্তিশালী হিন্দুরাজারা বর্তমান ছিলেন। সুলতানদের সম্বন্ধে এঁরা বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করতেন। ফলে একটি অঞ্চলকেই বহুবার জয় করতে হত। সাধারণত মনে করা হয় যে তুর্কিদের কয়েকটি অশ্বারোহী দলই সারা ভারত জয় করে। আসলে তা মোটেই সত্যি নয়, না বাঙলার পক্ষে, না ভারতের পক্ষে। মোগল আমলের আগে সারা বাঙলাদেশ মুসলমানসেনা দ্বারা বিজিত হয় নি, অনেক জায়গায় তারা যায়ই নি। বরিন্দের ওপারে গিয়াস্‌উদ্‌দিন খিল্‌জির মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর্যন্ত মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

মাম্‌লুকদের অধীনে বাঙলাদেশ
(১২২৭-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

এই ষাট বছরে পনেরোজন শাসক লখ্‌নাবতিতে শাসন করেন। এঁদের মধ্যে দশজন ছিলেন দিল্লীর রাজদরবারের দাস বা 'মাম্‌লুক'। এই মাম্‌লুকেরা মধ্য এশিয়ার নানা জাতির লোক ছিলেন। কেউ খিতাই তুর্ক্‌, কেউ কিপ্‌চাক, কেউ-বা উজ্‌বেক। অল্পবয়সেই এঁরা দাস হিসাবে বিক্রীত হয়েছিলেন। বাঙলার শাসনকর্তা হবার আগে এঁরা প্রত্যেকেই দিল্লীর মাম্‌লুক দরবারে প্রতিপত্তিশালী 'মালিক' পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এঁরা রাজকীয় পারিবারিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতেন আর বিভিন্ন প্রদেশের প্রদেশপালও হতেন। এঁরা নিজেরাও আবার বিরাট একদল মাম্‌লুকের মনিব ছিলেন। এইসব দাসেরা তাদের মনিবদের ক্ষমতা ও সম্মানের প্রধান উৎস ছিল। এঁদের আমলে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে লখ্‌নাবতি দিল্লীর দরবারের প্রতিরূপ হয়ে উঠল। এঁরা বাঙলায় যে শাসনব্যবস্থা চালু করলেন তা-ও ইল্‌তুত্‌মিশ-বংশের রাজ্যশাসনপদ্ধতির অবিকল নকল। এর রূপ ছিল সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের স্তরপরম্পরায় বিকেন্দ্রিত ছোটোখাটো শাসকবৃন্দ। এটা অবশ্য শুধু দিল্লী বা লখ্‌নাবতির বৈশিষ্ট্য ছিল না। তৎকালীন তুর্কি-শাসিত মুসলমানজগতের সব জায়গার চেহারাই ছিল এইরকম।

এই যুগের ইতিহাস আভ্যন্তরিক কলহ, সিংহাসনাধিকার ও হত্যার এক ক্লেদাক্ত ঘটনাপঞ্জী। সুলতান ইল্‌তুত্‌মিশের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবার তা প্রতিহত করতে পারত না। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির,

বিহার, অযোধ্যা, কনৌজ ও কারা-মানিকপুরের শাসকদের সকলেরই চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল লখ্‌নাবতির মসনদ অধিকার। কারণ, স্বাধীনতা অবলুপ্তির পরেও গৌড়-লখ্‌নাবতি তার রাজ্যসত্তা বজায় রেখেছিল এবং একমাত্র লখ্‌নাবতি অধিকারই কোনো 'মালিক'কে বহুবাঞ্ছিত "মালিক-উশ্‌-শর্‌ক্‌" অর্থাৎ পূর্বদেশাধিপতি-উপাধিভূষিত করতে পারত। বাঙলায় শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে যে-কেউ শাসনকর্তাকে ছলেবলে-কৌশলে বা খুন করে সরাতে পারবে সেই-ই বিনাপ্রতিবাদে আইনসঙ্গত শাসক হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। আর বাঙালীরা, কি তুর্কি কি অন্যজাতীয় মুসলমান কি হিন্দু, সাধারণভাবে তাদের শাসনকর্তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে নির্বিকার থাকত। তারা নিজেরা একটা সংবিধানগত নীতি চালু করল যে প্রজার বিশ্বস্ততা মসনদের প্রতি, মসনদাধিকারীর প্রতি নয়। এইটেই ছিল রাজধানীতে ঘন ঘন বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী ফল। নিজেদের প্রজাদের মতোই মাম্‌লুকেরা দিল্লীর মসনদের প্রতি একই ধরনের নিষ্ক্রিয় আনুগত্য দেখাতেন। তাঁদের অধিকাংশই ইল্‌তুত্‌মিশের নিমকের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতেন 'খুত্‌বা' পড়িয়ে, তাঁর নামে মুদ্রা প্রচলন করে এবং তাঁর পরিবারের যে যখন মসনদে বসতেন তাঁকে উপহার পাঠিয়ে সম্মান দেখিয়ে।

এই যুগের ইতিহাসের আরেকটি লক্ষণীয় নিদর্শন হল বিজেতাদের ও বিজিত হিন্দু প্রজাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও মিলমিশ করে নেবার সূত্রপাত। মুসলমান-অধিকৃত ভূভাগ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বহুল সংখ্যায় দেশত্যাগ আস্তে আস্তে বন্ধ হতে লাগল। এবং এই সময়েই সর্বপ্রথম রাজধানীতে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে হিন্দুদের নাম পাওয়া যায়। উড়িষ্যাধিপতি যখন রাজধানী অবরোধ

করতে উদ্যত তখন বরেন্দ্রের হিন্দুপ্রজাদের তরফে আভ্যন্তরিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে মুসলমান শাসকেরা মুক্ত ছিলেন।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই যুগে ইসলামের অবস্থা ছিল স্থাণু। এবং লখ্‌নাবতির মুসলমানশক্তি কামরূপ, পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার তুলনায় কিছুটা অধঃপতিতই হয়েছিল। কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য আগন্তুক মোঙ্গোলীয় উপজাতিদের 'বারা ভুঁইয়া' গোষ্ঠীর দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছিল। নব্য-হিন্দুধর্মের প্রেরণায় কোচ, মেচ, থারু এবং অন্যান্য মোঙ্গোলীয় উপজাতিরা ক্ষত্রিয় ভূমিকা বরণ করে নেয়। এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল করতোয়া ও সুবর্ণশ্রী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে মুসলমানশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যপূর্ণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর আরও পুবে উত্তর ব্রহ্ম থেকে আগত শান অভিযানকারীরা তাঁদের রাজা সুখাফা ও তৎপুত্র সুতেফা-র (১২৬৮-৮১) নেতৃত্বে গৌহাটির আহোম রাজ্যে ভিত্তিস্থাপনা করে। হিন্দুধর্ম তার প্রাণশক্তির বলে শানদের বৌদ্ধধর্মকে রূপান্তরিত করে ইসলামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিরোধ-প্রাচীর হয়ে ওঠে। যখন সমাজের বিশুদ্ধিকরণে ও কৌলীন্যপ্রথার পুনঃরূপায়ণে ব্যস্ত সেনরাজ্যের শক্তি ক্ষয়িত হচ্ছিল, সেই সময়ে পুব ও দক্ষিণ বাঙলার অধিকাংশের মালিকানা তেরো শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী কায়স্থ শাসকবংশের হাতে চলে যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ বা বরিশাল জেলার দশরথ-দনুজমর্দনদেব। লখ্‌নাবতির সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উড়িষ্যার শক্তিশালী পূর্বীয় গঙ্গ-সাম্রাজ্য। বৈতরণীকূলে অবস্থিত গঙ্গদের অধীন জনৈক জাজপুরের নৃপতি লখ্‌নাবতির মাম্‌লুক্‌দের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

তারপর বাঙলার রাজনৈতিক জীবনে চলতে থাকল মসনদ

অধিকারের দ্বন্দ্ব আর দিল্লীর দরবার থেকে তার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা। দিল্লীর সুলতান চাইতেন বাঙলাকে অধীন রাজ্যে পরিণত করতে আর বঙ্গাধিপতিরা চাইতেন স্বাধীনতা।

এই ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের ফলে কোনো লোকই বেশিদিন রাজত্ব করতে পারতেন না হাজারো গুণ থাকলেও। দু-এক বছরের বেশি সময় সুলতানি করা ছিল বিস্ময়কর কীর্তি।

গিয়াস্উদ্দিন খিল্জির মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ বাঙলা ও অযোধ্যাকে এক করেন। বছর দেড়েক রাজত্ব করার পর তিনি মারা যান। পরবর্তী শাসনকর্তা মালিক ইখ্তিয়ারুদ্দিন বল্কা খিল্জি দিল্লীর লোকদের একেবারেই বাঙলা-ছাড়া করেন। অল্পদিন বাদেই ইল্তুত্মিশ আবার বাঙলা অভিযান করেন। বল্কা পরাজিত ও নিহত হন। বিহারের শাসনকর্তা মালিক আলাউদ্দিন জানি-কে ইল্তুত্মিশ বাঙলার প্রদেশপাল নিযুক্ত করেন। কিছুদিন বাদে তাঁর স্থানে মালিক সইফুদ্দিন আইবক বাঙলার শাসক হয়ে আসেন। তারপর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তুঘ্রল-তুঘান খান।

মালিক ইজ্জ্দ্দিন তুঘ্রল-তুঘান খান প্রায় নয় বছর বাঙলা শাসন করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের কাছে মামুলি নতি স্বীকার করে কাজ করতেন। বাঙলাদেশের অন্যান্য স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বাঙলার মুসলমান অধিকৃত অঞ্চল ইবাজের আমলে যা ছিল তাই রইল। কিন্তু তিনি পশ্চিমের মুসলমান-অধিকৃত প্রদেশগুলি অধিকারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পশ্চিম অভিযান থেকে তিনি সফলকাম হয়ে লখ্নাবতি ফিরে আসেন। কিন্তু সে গৌরবচ্ছটা বেশিদিন টিকল না। ১২৪৩ সালে উড়িষ্যার গঙ্গরাজা প্রথম নরসিংহদেব তুঘ্রলের অনুপস্থিতিতে রাঢ়

আক্রমণ করেন। প্রথমটায় তুঘ্রল নিষ্ক্রিয় থাকলেও পরে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে তাঁর পরাজয় ঘটে। আর এইটেই ভারতে মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিরাট বিপর্যয়।

এর অল্প পরেই অযোধ্যার প্রদেশপাল মালিক তামার খান লখ্‌নাবতি অবরোধ করেন। তুঘ্রল পরাজিত ও বিতাড়িত হন। দু বছর বাদে তুঘ্রল দিল্লীর সুলতানের সাহায্যে পুরাতন পদ ফিরে পান কিন্তু বাঙলায় পৌঁছেই তিনি মারা যান। এদিকে তামার খানও একই সময়ে গতাসু হন। দশ বছর ধরে মুসলমানেরা গঙ্গার দক্ষিণের অঞ্চল, যা উড়িষ্যারাজ জয় করে নেন, আর পুনরুদ্ধার করতে পারে নি।

এরপর প্রদেশপাল হলেন মালিক জালালুদ্‌দিন মাসুদ জানি। চার বছর শাসন করে তিনি মারা যান (১২৫১ খ্রীঃ)। তাঁর পরে অযোধ্যার শাসক মালিক ইখ্‌তিয়ারুদ্‌দিন ইউজ্‌বক বাঙলার শাসনকর্তা হন। ইউজ্‌বক ছিলেন জন্ম-বিদ্রোহী। সুলতানের বিরুদ্ধে বার কয়েক বিদ্রোহ করলেও অবশেষে তিনি ক্ষমালাভ করেন ও তাঁর পদোন্নতি হয়। বাঙলার মসনদে বসে তিনি তুর্কি শক্তির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে রাঢ় আক্রমণ করেন। কিন্তু হুগলী জেলার মদারন-রাজের নিকট চরমভাবে পরাজিত হন। নিরুৎসাহ না হয়ে দু বছর পরে তিনি সুকৌশলে মদারন-রাজকে পরাজিত করেন। তারপর তিনি সমগ্র রাঢ় পুনরধিকার ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠ করেন। এর পরেই তিনি নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন ও মুদ্রা চালু করেন।

সুলতান মুঘিসুউদ্‌দিন তারপর বিহার ও অযোধ্যা স্বীয় অধিকারে

আনেন দিল্লীর দুর্বলতার সুযোগে। তিনটি প্রদেশের অধিপতি হয়ে তিনি দিল্লীকে উপেক্ষা করতে শুরু করেন। লখ্‌নাবতির হিন্দু-মুসলমান প্রজারা তাঁর এই মনোভাব সমর্থন করত না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মুঘিস্ কিন্তু তাতে কর্ণপাত করতেন না। দিল্লীর ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তিনি কামরূপ অভিযানে বের হন। কামরূপ-রাজ যুদ্ধ না করে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। মুঘিস কামরূপের রাজধানী দখল করে প্রচুর ধনরত্নের মালিক হন। কিন্তু উন্নততর রণকৌশলের সাহায্যে প্রায় আধুনিক যুদ্ধের "পোড়ামাটি" ও গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করে কামরূপরাজ বর্ষাকালে মুসলমান সেনাদল বিধ্বস্ত করেন। সপরিবারে সুলতান কামরূপরাজের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থাতেই তিনি মারা যান। তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য লখ্‌নাবতির সৈন্যক্ষয় হল। এই পরাজয়ের ফলে কোচ ও মেচদের নিকট তুর্কি সেনাদের অজেয়তার মোহ ভেঙে গেল এবং মধ্যযুগের বাঙলার পরবর্তী তিন শতকের ইতিহাস কোচ প্রভৃতি জাতিরা গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হল।

১২৫৭ সালে সুলতানের মুঘিসউদ্‌দিনের শোচনীয় ভাগ্যের পরে লখ্‌নাবতি আবার দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করল। তারপর পরপর কয়েকজন শাসনকর্তা বাঙলার মসনদ দখল করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাতার খান। তিনি সুলতান গিয়াসুউদ্‌দিন বলবনের আধিপত্য মেনে নেন। তাতার খানের মৃত্যুর পর শের খান ও তাঁর পরে আমিন খান দিল্লী থেকে বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আমিন খানের সময়ে আর-একজন উপ-শাসনকর্তাও নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মুসলমান শক্তি পূর্ব বাঙলার কিছুটা অংশ দখল করে। উপ-শাসনকর্তা পদের সৃষ্টি বোধহয় সেজন্যই।

বলবন বংশাধিকারে বাঙলাদেশ

আমিন খানের সঙ্গে তুগ্রল খান বাঙলার উপ-প্রদেশপাল হয়ে আসেন। আমিন খানের অধীন হলেও কার্যত তুগ্রলই সর্বেসর্বা ছিলেন। মামলুকদের ভিতরে তুগ্রল ছিলেন সর্বশেষ ও সবচেয়ে সফল ব্যক্তি যিনি গৃহদাসের অবস্থা থেকে স্থলতান ঘিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে বাঙলার স্বাধীন শাসক হয়েছিলেন। তুর্কিদের সমস্ত বিশিষ্ট গুণ তাঁর ছিল : অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা, বেয়াড়া দুঃসাহস, উপায়-কুশলতা ও সীমাহীন উচ্চাশা। আমিন খানের নায়েব হিসাবে তুগ্রলের নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় বাঙলার শাসককে কিছুটা অবদমিত রাখা। ১২৬৮ সালে তুগ্রলের নিয়োগের সময় বলবন বিহারকে লখনাবতি থেকে স্বতন্ত্র করে দেন। ফলে বাঙলা দিল্লী সাম্রাজ্যচ্যুত হলেও বিহার সাম্রাজ্যের ভিতরেই থেকে যেত।

তুগ্রল পূর্ববঙ্গে অনেকদূর পর্যন্ত (ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায়) মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। সোনারগাঁর কাছে তিনি কিল্লা-ই-তুগ্রল নামে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। এই সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা স্থাপিত হয়। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ বা বরিশাল জেলার রাজা দনুজ রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। তুগ্রল রাঢ় অঞ্চলেও অভিযান চালান। এতে তিনি প্রচুর ধনরত্ন ও হাতি জয় করেন। এর অল্পপরেই দিল্লীর সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। তিনি স্থলতান মুঘিসউদ্দিন নাম গ্রহণ করে স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করেন ও স্বনামে খুতবা পড়ার বন্দোবস্ত করেন। লখনাবতির

রাজদরবার জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যে দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এবং তুঘ্রল বেশ জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও সুখে-দুঃখে অনুসরণ করত। বাঙলা আক্রমণের সময় সেজন্য বলবন শুধু একটি লোকের বিরুদ্ধে নয় একটি দেশের সমস্ত লোকের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বহু বছর ধরে দিল্লীর সুলতান নিজে সেনাদলের ভার নিয়ে অনেক কষ্টে তুঘ্রলকে পরাজিত ও নিহত করেন। তুঘ্রলের পরিবারবর্গ ও অনুচরদের তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তাঁর নৃশংসতায় তাঁর পারিষদবর্গও শিউরে উঠত। অবশেষে বলবন তাঁর ছেলে বুঘরা খানকে লখনাবতির মসনদে বসিয়ে ১২৮১ সালে বাঙলা ত্যাগ করেন। কিন্তু চার বছরের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে মিথ্যেই তিনি অত কষ্ট করে তুঘ্রলকে দমন করে বাঙলাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বাঙলার স্বাধীনতা-স্পৃহার 'বিষ'ও বুঘরা খানের মনে সঞ্চারিত হল।

বলবনী আমলের (১২৮৬-১৩২৮ খ্রীঃ) সাধারণ বৈশিষ্ট্য ॥

বোধহয় এই যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক সকল রকমের লিখিত দলিলের অভাব। যেসব উপাদান পাওয়া যায় তা অতিক্ষয়িত কিছু মুদ্রা আর কিছু কিছু নাম। আর এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদের শেষ নেই।

এই যুগের শেষভাগে লখনাবতির ইতিহাস খাস বাঙলার ইতিহাস হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙলা তার সুপরিচিত বিভাগগুলি অর্থাৎ লখনাবতি, সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), সোনারগাঁ ও চাটগাঁ নিয়ে দেখা দেয়। বঙ্গ বা পূর্ববাঙলার রাজধানী সোনারগাঁ

বাঙলার মসনদের সিঁড়ি হয়ে ওঠে। সব দিক থেকেই সোনারগাঁ প্রাচীন রাজধানী লখনাবতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এ যুগ বাঙলাদেশে ও তার আশেপাশের অঞ্চলে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তারের যুগ। এর কয়েকটি কারণ ছিল। খিল্‌জিদের দ্বারা মাম্‌লুক তুর্কিদের উৎখাতের পরে খাঁটি তুর্কিরা, যারা খিল্‌জিদের নীচ-বংশোদ্ভব বলে ঘৃণা করত, বহু সংখ্যায় সুদূর বাঙলাদেশে চলে যায়। দ্বিতীয়ত, বাঙলা বহুদিন পর্যন্ত আক্রমণাত্মক খিল্‌জি ও তুঘলুক সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত ছিল। এদের ধাক্কা চোদ্দ শতকের গোড়ার দিকেই বাঙলায় এসে লাগে। ফলে বাঙলাদেশের বলবন-বংশীয় শাসকেরা পশ্চিমের দিকে নজর দিতে না পেরে তখনো পর্যন্ত যেসব ছোটো ছোটো হিন্দুরাজ্য মুসলমান-আধিপত্য ঠেকিয়ে রাখছিল তাদের দমন করার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। এদের সঙ্গে যুক্ত হল ইসলামধর্মের গাজী ও আউলিয়ারা যাঁরা এই সময় থেকে বাঙলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই সব গাজী ও আউলিয়ারা ছিলেন ইসলামের বিজয়ধ্বজার বাহক সংগ্রামী সাধুসন্ত। ঈশ্বরভক্তির অপেক্ষা ঐহিক শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য এঁদের কম ছিল না। সিলেট ও পাণ্ডুয়া-বিজয়ের কাহিনী সত্যি হলে একথা স্বীকার করতে হবে যে এঁরা অনেক সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তিদের দল নিয়ে হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করতেন। তারপর মুসলমানদের অধিকারে হস্তক্ষেপের জিগির তুলে মুসলমানরাজ্যের সৈন্যদল আনাতেন কাফের রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে। সুলতান জালালুদ্‌দিন খিল্‌জি বহু ঠগী ও দস্যুদের বাঙলাদেশে এইসময় চালান দিতেন। একজন ঐতিহাসিকের মতে বাঙলার শাসকেরা অন্য কোনো পথ না পেয়ে

এইসব বিদেশীদের নিয়ে গঠিত সেনাদলে ভরতি করে নিতেন বাঙলার প্রান্তশায়ী হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য।

বলবন-বংশের রাজত্ব শুধু রাজ্য-বিস্তারের যুগ নয়, সুদৃঢ়ভাবে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার যুগও। এই সময়ে ইসলামের পীর, দরবেশ প্রভৃতিরা ধর্মপরায়ণতা, শক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত উদাহরণের সাহায্যে বিপুল আকারে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালান। এ কাজ তাঁরা করেন গায়ের জোরে নয়, নিজেদের বিশ্বাস ও অনিন্দ্য চরিত্রবলে। সেই সময়ে কুসংস্কার ও সামাজিক নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট নীচ-জাতীয় হিন্দুদের ভিতরে তাঁরা বাস ও ধর্মপ্রচার করতেন। গ্রামাঞ্চলের এই সব নতুন ধর্মান্তর-গ্রহণকারীরা মুসলমান সরকারের শক্তিবৃদ্ধির একটা নতুন উপায়ও হয়েছিল। বাঙলাদেশের সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিজয়ের দেড়শো বছর পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসর-জমিয়ে-বসা মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্থাগুলির চেষ্টায় শুরু হল দেশের নৈতিক ও আত্মিক বিজয়। মন্দির ও মঠ ধ্বংস করে প্রথম দিকের মুসলমান অভিযানকারীরা কেবল তাদের ধনরত্নই লুঠ করেছে। কিন্তু তরবারি কখনোই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারত না, পারত না হিন্দুদের চিরন্তন আত্মিক ঐশ্বর্য অপহরণ করতে—আর এর ভিতরেই নিহিত ছিল হিন্দু পৌত্তলিকতা ও হিন্দু জাতীয়তাবোধের বীজ। ইসলামের 'সন্ত'রা নৈতিক ও আত্মিক বিজয়রথের অগ্রগমনকে সম্পূর্ণ করলেন সজ্ঞানে হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজাস্থানের উপর তাঁদের দরগা প্রভৃতি স্থাপন করে। সিদ্ধা ও যোগীদের মতোই লোক-সমাজে তাদের কেরামতির গল্প চলিত হল। ফলে এই সব পবিত্র 'থান'গুলির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হল এবং হিন্দু দেবতা বা সিদ্ধার বদলে ইসলামের পীর বা গাজীর সম্বন্ধে লৌকিক কল্পনায় মূলত পুরনো কাহিনীই চলতে

লাগল বা নতুন বেশে মুসলমানদের মধ্যেও উদ্‌ভূত হল। হিন্দুরা বহুকাল যাবং এইসব স্থানগুলিকে সম্মান করত। তারা আস্তে আস্তে এগুলির মূল তাৎপর্য ও কাহিনী ভুলে গেল এবং ক্রমে অনেক সহজেই তারা পীর ও গাজীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে পারল। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই সমন্বয় শেষ পর্যন্ত একটা অনেক বেশি উদার আবহাওয়া সৃষ্টি করল, যার ফলে হিন্দুরা তাদের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য সম্বন্ধে অনেকটা নির্বিকার হয়ে গেল। এইভাবে হিন্দুসমাজের, বিশেষ করে নিম্নবর্ণগুলির, ভিতরে ইসলামের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র তৈরি হল। এই সব পীর ও গাজীদের মহিমার সম্বন্ধে বহুদিন প্রচার ও ইসলামের অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থার আকর্ষণে এরা আস্তে আস্তে ইসলামধর্মের মধ্যে এসে গেল। কিন্তু পীর ও গাজীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই হুবহু হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাকাহিনী থেকে নেওয়া হত। এর অন্যতম উদাহরণ হল রাজগিরের সৃঙ্গি-ঋষি-কুণ্ডর মখদুম-কুণ্ডে ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী বুদ্ধের মখদুম-সাহেবে রূপান্তর।

গিয়াস্‌উদ্‌দিন-পুত্র বুঘ্‌রা খান, বাঙলার তথাকথিত বলবনী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, ছয় বছর বাঙলার শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন (১২৮১-৮৭ খ্রীঃ)। তিনি বিলাসব্যসনে সময় কাটালেও তাঁর অনুচরেরা তাঁর আধিপত্য বজায় রাখত। সুলতান গিয়াস্‌উদ্‌দিন বলবনের মৃত্যুর পর ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুলতান নাসিরুদ্‌দিন নাম নেন।

নাসিরুদ্‌দিনের পরে তাঁর ছেলে কাইকৌস সুলতান রুকনুদ্‌দিন কাইকৌস নামে বাঙলার মসনদে বসেন (১২৯০ খ্রীঃ)। অন্তত আটবছর

ধরে তিনি বিহার ও বাঙলার সর্বস্বীকৃত অধিপতি ছিলেন। তাঁর পিতার আমলের সুলতানী বাঙলা চারটে বড়ো শাসন-এলাকায় ভাগ হয়ে যায়—বিহার, সাতগাঁ, বঙ্গ ও দেবকোট।

বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বাধীনতার ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে বাঙলার জল-মাটি-বায়ুতে বর্তমান। হিন্দু রাজারা উৎখাত হবার পর তাঁদের মুসলমান উত্তরাধিকারীরাও সেই স্বাধীনতার কামনায় জর্জরিত হয়ে উঠতেন। সারা বাঙলার মসনদ অধিকারীতেও এই আকাঙ্ক্ষা সংক্রামিত হত। অবশ্য বাঙলার ভৌগোলিক বিন্যাসও ছিল খণ্ডখণ্ড। বড়ো বড়ো নদী দেশকে বিরাট বিরাট ভূভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে,—সেদিনে গতায়াত ও যোগাযোগ তত সহজ ছিল না। এর কারণ হল এই ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য। বাঙলার মুসলমান শাসকেরা এই ঐতিহ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভুলে গেলেন তাঁদের প্রত্যেকের সাধারণ বিপদ, ভুলে গেলেন যে তাঁদের ধর্ম ও একজাতীয়তা-বোধই গোড়ার দিকে তাঁদের বিজয়-অভিযানকে সফল করেছিল। বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার এই ঝোঁক চোদ্দ শতক থেকে প্রকাশ পেতে থাকে ও অবশেষে ষোলো শতকে তা রূপ নেয় 'বারো ভুঁইয়া'তে।

সুলতান রুক্‌নুদ্‌দিন এইসব সামন্তদের উপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। রুক্‌নুদ্‌দিনের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান জালালুদ্‌দিন খিলজির সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে নি।

দিল্লীর যে দাস-রাজত্ব খিল্‌জিদের আমলে শেষ হয়ে গেল বাঙলাদেশে তা আরও প্রায় চল্লিশ বছর টিকে ছিল। মহম্মদ তুঘলক যখন বাঙলাদেশ জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করলেন কেবল তখনই বাঙলায় দাস-রাজত্ব শেষ হয়।

সুলতানের একজন 'দাস' ফিরুজ, রুক্‌নুদ্‌দিনের আমলে সমস্ত রাজকার্য দেখাশোনা করতেন। রুক্‌নুদ্‌দিনের মৃত্যুর পর ১৩০১ সালে তিনি সুলতান শামসুদ্‌দিন ফিরুজ শাহ্‌ নামে বাঙলার মসনদে বসেন। ফিরুজ শাহের আমলের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হল ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তার। সাতগাঁ ও সোনারগাঁয়ে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের চোখ ঐদিকে যায়।

সুলতান শামসুদ্‌দিনের দীর্ঘ রাজত্বকালের (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) শেষ দিকে তাঁর পুত্ররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

শামসুদ্‌দিনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরের ইতিহাস প্রায় কিছুই জানা যায় না। সমস্তটাই অস্পষ্ট ও নানা গোলমালে ভরতি। কিছুদিন বাদে শামসুদ্‌দিনের ছেলে বাহাদুর বাঙলার মসনদে বসেন। তাঁর রাজত্বকালেই বাঙলাদেশে তুঘ্‌লক আক্রমণ শুরু হয়। সুলতান গিয়াস্‌উদ্‌দিন তুঘ্‌লক শাহ্‌ ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা অভিযানে আসেন। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ পরাজিত ও বন্দী হন।

তুঘলক শাহ্‌ বাঙলা শাসনের ভার দেন নাসিরুদ্‌দিন ইব্রাহিমের উপর। বাঙলার স্বাধীন সত্তা অবলুপ্ত হল। ১৩২৫ সালে মহম্মদ তুঘলক দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। বাঙলাদেশ পুরোপুরি নিজের সাম্রাজ্যের ভিতরে রাখবার জন্য তিনি বাহাদুর শাহ্‌কে মুক্তি দিয়ে সোনারগাঁয়ে ফেরত পাঠান। সেখানে বাহ্‌রাম খানের সঙ্গে একযোগে সামন্ত-নরপতি হিসাবে বাহাদুর সোনারগাঁ শাসন করতে থাকলেন। মহম্মদ তুঘ্‌লক এইরকম আরও অনেক কর্ম-

চারী নিয়োগ করেন যাতে বাঙলায় কোনো একজনই সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে না পারে। কিছুদিন বাদে নাসিরুদ্‌দিন দিল্লী চলে যান এবং বাহাত্বর শাহ্‌ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। মহম্মদ নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন ও বাহাত্বর শাহ্‌ নিহত হন।

লখ্‌নাবতি, সাতগাঁ ও সোনারগাঁ তিনজন শাসনকর্তার অধীনে থাকে। এবং পরবর্তী দশ বছর বাঙলায় কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। ১৩৩৯ সালের পর বাঙলায় আবার বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ১৩৪০ সালের পর বাঙলা আস্তে আস্তে তুঘ্‌লক সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইলিয়াস শাহী বংশ

১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের লখ্‌নাবতির সিংহাসন অধিকারে বাঙলার ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূচনা হল। ইলিয়াস শাহের মসনদাধিকারের সময় মহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্যের টালমাটাল অবস্থার সুযোগে তিরহুত, চম্পারন, গোরখপুরের হিন্দুরাজারা স্বাধীন হন। কিন্তু তাঁদের কোনো একতা ছিল না। এই সুযোগে ইলিয়াস শাহ পশ্চিমে রাজ্যজয়ে এগোন। প্রথমে তিরহুত আভ্যন্তরিক বিবাদের জন্য তাঁর করতলগত হয়। এরপর ১৩৪৬ সালে তিনি নেপাল জয় করেন। কিছুদিন বাদে আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ইলিয়াস শাহ্‌ উড়িষ্যা অভিযান করেন। এই প্রথম তাঁর নেতৃত্বে মুসলমান-শক্তি উড়িষ্যা কতকাংশ জয়ে সক্ষম হল। তারপর তিনি চম্পারন ও গোরখপুরের রাজাদের আনুগত্য লাভ করলেন। পরপর জয়লাভে তিনি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, কিন্তু ১৩৫৩ সালে সুলতান ফিরুজ দিল্লীর তখ্‌তে বসলে সে স্বপ্ন ভেঙে গেল। ঐ বছরই বিপুল এক বাহিনী নিয়ে ফিরুজ শাহ তুঘলক বাঙলা অভিযান করলেন এবং বাঙলায় তৎকালীন রাজধানী পাণ্ডুয়া বা ফিরুজাবাদ অধিকার করেন। ইলিয়াস পূর্ব-বাঙলার ধলেশ্বরীর তীরে একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরুজ বাঙালীদের নানা প্রলোভন দেখিয়েছিলেন ইলিয়াসের বিরোধিতা করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত একদল বিশ্বাসঘাতক কালন্দর ফকিরের সাহায্যে তিনি ইলিয়াসকে সসৈন্যে দুর্গের বাইরে আনতে ও পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু ফিরুজ একডালা অধিকার না করেই দিল্লী ফিরে যান।

পরাজয়ের পর পরাজয় ইলিয়াসের ভাগ্যে জোটে, লখ্‌নাবতির পশ্চিমের সমস্ত বিজিত অঞ্চলই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু বাঙলাদেশে তাঁর আধিপত্যে এতটুকুও চিড় ধরে নি। রাজত্বের শেষ কয়বছর তিনি দিল্লীর সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলেন। এই সময়ের শেষ কীর্তি হল কামরূপ অধিকার। বোধহয় ১৩৫৮ সালে ইলিয়াস শাহ মারা যান। হাজী ইলিয়াস শাহের শাসন, জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সিকন্দর শাহ ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার সুলতান হন। তিনিও পিতার মতোই শক্তিমান ও যোগ্য নৃপতি ছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না। ১৩৫৯ সালের পরবর্তী প্রায় তুই শতাব্দী কাল বাঙলাদেশ দিল্লীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

এর পরের শান্তিপূর্ণ বছরগুলি সিকন্দর তাঁর রাজধানী পাণ্ডুয়ার সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে নিয়োগ করেন। এর স্মৃতি এখনো আদিনার মসজিদে বর্তমান। পুত্রদের কলহবিবাদে তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর অশান্তিতে ভরে যায়।

সুলতান ফিরুজের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বছরগুলির বাঙলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বাস করে করে বাঙলা-দেশ বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর শের শাহের আমল পর্যন্ত এই দিনগত পাপক্ষয়ের কাজই চলতে থাকল। এই অবস্থায় সমস্ত ঝামেলামুক্ত হয়ে হাজী ইলিয়াসের বংশধরেরা আলস্যে ও বিলাসব্যসনে দিন কাটাতে থাকলেন। আর সঞ্চয় করতে

থাকলেন অজস্র ধনরত্ন। এই শান্তির সময়ে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা ঠিক। কিন্তু এদের কোনো ইতিহাসই আর রইল না প্রায়। যেটুকু খবর পাওয়া যায় তা লোকস্মৃতিতে বিধৃত নানা কাহিনী। আকবরের আমলে নতুন করে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বাঙলার ইতিহাস আবার লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু মাঝের এই একশো বছরের ইতিহাস বলতে কিছুই তাঁরাও দিতে পারলেন না।

সিকন্দরের পরে সুলতান হলেন গিয়াস্উদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীঃ)। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সম্বন্ধে রচিত কাজীর বিচারের লোককাহিনীতে।

১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে আজম শাহ নিহত হন। তার পরে শুরু হয় গৃহবিবাদ। সেনানায়কেরা তাঁর ছেলে সৈফুদ্দিন হাম্জা শাহ্কে মসনদে বসান। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে তিনিও সিংহাসন হারান। এবং ১৪১০ সাল থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে একটি হিন্দু রাজ-বংশ (শেষ দিকে এঁরা মুসলমান হয়ে যান) বাঙলায় রাজত্ব করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গণেশ বলে পরিচিত। হয়তো তাঁর নাম ছিল কংস, অথবা তিনি কোচ জাতির দুর্ধর্ষ নায়কও হতে পারেন। কেউ কেউ তাঁকে মুদ্রায় উল্লেখিত দনুজমর্দন ও কৃত্তিবাসের কল্পিত গৌড়রাজ বলেও অনুমান করেন।

রাজা গণেশ বা তৎপুত্র জালালুদ্দিন বা তৎপুত্র আহ্মদ শাহের কোনো লিপি, এমনকি পনেরো শতকের কোনো লেখায় তাঁদের সম্বন্ধে কোনো কিছুই, পাওয়া যায় না। বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনীর আলোচনা ও বিচার করে যা জানা গেছে তা এই—ইলিয়াস শাহী

বংশের শেষ তিনজন সুলতান নাবালক ও অশক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মন্ত্রিবর্গ ও রাজ্যের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত ও সমর্থিত হতেন। গিয়াস্‌উদ্‌দিন আজম শাহের রাজত্বকালের শেষদিকে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন গণেশ। তিনি আপন অধিকারেই দিনাজপুরে বিপুল ভূসম্পত্তি ও নিজস্ব সেনা-বাহিনীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা প্রায় সকলেই ছিল মোঙ্গোলীয় কোচ গোষ্ঠীর এবং নিম্নবঙ্গের সৈন্যদের চেয়ে অনেক বেশি পরাক্রমশালী। এই সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গণেশের ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা। ফলে তিনি রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। সুলতান নামে মাত্র, আসল শাসক ছিলেন গণেশ। তাঁর প্রভাবে অনেকেরই চোখ টাটাতে থাকে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানের হারেমে ও অন্যান্য ক্ষুব্ধ সভাসদদের মধ্যে চক্রান্ত ও বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। অবশেষে শেষ ইলিয়াস শাহী সুলতান আলাউদ্‌দিন ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর গণেশ স্বয়ং বাঙলার মসনদে বসেন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ।

এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ মুসলমান মালিক ও দরবেশরা গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের সুলতানকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে একটা মিটমাট হয় এবং গণেশ "দনুজমর্দনদেব" উপাধি গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ বছর দুয়েক তিনি যখন স্বনামে রাজত্ব করেন তখন নির্বিবাদেই তিনি শাসন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাঁর শাসন সশ্রদ্ধ চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

গণেশের ছেলে যদুসেন (তিনি মাঝখানে মুসলমান হয়েছিলেন) বাঙলার তখ্‌তে বসেন। গণেশ শুদ্ধি করে তাঁকে হিন্দু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু না হিন্দু না মুসলমান কোনো সমাজেই তিনি

গৃহীত হলেন না। মসনদে বসার সময় তিনি আবার মুসলমান হন ও জালালুদ্‌দিন নামে পরিচিত হন। তিনি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন, বোধহয় তাঁকে হিন্দু হিসেবে পুনর্গ্রহণ না করার জন্য। এই সময়ে জালালের ছোটোভাই মহেন্দ্রদেবকে কেন্দ্র করে হিন্দু পারিষদেরা জালালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেন। ফল কিছুই হয় না। বরং জালালের হিন্দুবিদ্বেষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্‌দিন মারা যান। তাঁর পুত্র শামসুদ্‌দিন আহমদ শাহ মসনদ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ সভাসদেরা অবশেষে তাঁর দুই দাস—শাদি খান ও নাসির খানের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করেন (১৪৪২ খ্রীঃ)।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহীবংশ ও হাব্‌সী আমল
(১৪৪২-৯৩ খ্রীঃ)

কিছুদিনের জন্য আহমদ শাহের হত্যাকারীরা সমস্ত ক্ষমতা দখল করে রইলেন। কিন্তু পারস্পরিক ঈর্ষা ও কলহে দুজনেই অল্পদিনের মধ্যে নিহত হন। রাজ্যের প্রধানেরা তখন সবাই মিলে ইলিয়াসের এক বংশধরকে বাঙলার মসনদে বসান।

নতুন সুলতান নাসিরুদ্‌দিন আবুল মুজাফ্‌ফর মাহ্‌মুদ নাম নিয়ে বাঙলার অধিপতি হলেন। নাসিরুদ্‌দিন নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করতে পেরেছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ লোক ছিলেন এবং মসজিদ্‌, দরগা, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণ ও গৌড়ের সংস্কারেই তাঁর দিন কাটত। এই শান্তির মধ্যে তিনি বাঙলার লুপ্ত সামরিক শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। এবং যুদ্ধবিগ্রহ না করলেও তাঁর রাজত্বকালেই যশোহর ও খুলনার কিয়দংশ মুসলমান অধিকারে আসে। এই সময় পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলা উড়িষ্যার অধিকারে ছিল এবং মাঝে মাঝে দুই পক্ষের ভিতরে সংঘর্ষ বাধত। নাসিরুদ্‌দিনের রাজ্য যে বেশ বড়ো ও সুশাসিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া লিপি থেকে। নাসিরুদ্‌দিন ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

নাসিরুদ্‌দিনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র রুকনুদ্‌দিন বরবক বাঙলার অধিপতি হলেন। বাঙলার অধিকাংশ ইতিহাসই তাঁকে একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ সুলতান হিসেবে বর্ণনা করেছে।

তাদের মতে তাঁর রাজ্যে প্রজা ও সৈন্যেরা সুখে ও নিরাপদে বাস করত।

রুক্নুদ্দিনের আমলে তাঁর সেনাপতি ইসমাইলের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলা ও কামরূপে বিজয়ী মুসলমান অভিযান ঘটে।

রুক্নুদ্দিনের রাজত্বকালে প্রায় সারা বাঙলাতেই তাঁর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-রচয়িতা মালাধর বসু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করেছেন। কবি সুলতানের কাছ থেকে 'গুণরাজ খাঁ' এবং কবিপুত্র 'সত্যরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন।

১৪৭৪ সালে রুক্নুদ্দিন গতায়ু হলে তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন ইউসুফ সাত বছর রাজত্ব করেন। ইউসুফের ছেলে সুলতান হলেও উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় সিংহাসনচ্যুত হন এবং মাহমুদ-পুত্র হুসেন জলালুদ্দিন ফথ বাঙলার সুলতান হন।

জলাল বিচক্ষণ ও উদার শাসক ছিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি সবই বজায় রেখেছিলেন। দেশের লোকও সুখে-শান্তিতে বাস করত। কিন্তু এই সময়ে হাবসীরা একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বরবকের আমলে হাবসীরা প্রাসাদ ও সেনাদলের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইউসুফও সম্ভবত পিতার এই নীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু ক্ষমতা তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ক্রমেই তারা সাধারণের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করত। এই ঔদ্ধত্য অসহ্য হয়ে উঠলে জলাল তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বিনীতদের শাস্তি দেন। তখন তারা প্রাসাদের খোজাদের প্রধান সুলতান শাহজাদার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। শাহজাদা প্রাসাদরক্ষী পাইকদেরও নেতা

ছিলেন। কোনো যুদ্ধের সময়ে বিশ্বস্ত হাবসী সেনানায়ক আমির-উল-উমারা মালিক আন্দিলের অনুপস্থিতির সুযোগে সুলতান শাহ্-জাদা জলালকে খুন করতে সক্ষম হন (১৪৮৭ খ্রীঃ)।

জলালের মৃত্যুর সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশ শেষ হয়ে গেল। বাঙলাদেশের ইতিহাসে এই বংশের দান কম নয়। পরপর এই বংশের অনেক বিচক্ষণ সুলতান বাঙলার মসনদে বসেছেন ও বাঙলাকে সুশাসনে রেখেছেন। এঁরা উদার ও বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। এঁদের আমলে বাঙলাদেশে প্রচুর মসজিদ, দরগা, বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরি হয়েছিল। প্রায় দেড়শো বছর ধরে বাঙলার অর্থনৈতিক ও চিন্তাশীল জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময়ে অবশ্য ধর্ম ও ক্ষমতার তফাত ছাড়া অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিরোধ ছিল না। তাঁরাও তখন মনেপ্রাণে বাঙালী আর দিল্লী অনেক দূর। তাঁরা জানতেন যে বাঙলার উন্নতিতে তাঁদের উন্নতি, তাঁদের সমৃদ্ধি। সেইজন্যেই তাঁরা ফার্সী-আরবী ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের চর্চায় উৎসাহদান করেন। উদারচেতা এই সুলতানেরা তাই বাঙলার আপামর সাধারণের মধ্যে যে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন সৃষ্টি করেছিলেন তা লোকস্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। সেজন্যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর একটি স্থানীয় শাসকবংশ রাজত্ব করা সত্ত্বেও তার পরে বাঙালী জনসাধারণ আবার তাঁদের শাসক নির্বাচিত করেন। এবং এই জনপ্রিয়তার মূলে যে বিশ্বাস ছিল তা কোনোদিনই তাঁরা ক্ষুণ্ণ করেন নি। ফলে তাঁরা বাঙলার তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলেন।

হাবসী শাসন॥ জলালের মৃত্যুতে যে বিশৃঙ্খলা ও হাবসী-শাহীর

শুরু হল তার জন্যে বরবকের হাবসীপ্রীতিই দায়ী। এই সময়ে বাঙলার পুরনো অভিজাত এমন কেউ ছিলেন না যিনি অত্যা ও উচ্ছৃঙ্খল হাবসীদের বিরোধিতা করতে পারেন। তার উপর পুরনো অভিজাতেরা তখন ক্ষমতাহীন। তাই প্রতিরোধের কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না তাঁদের তরফে। রাজ্যের রক্ষকেরা রূপান্তরিত হল রাজ্যের অধীশ্বরে। আর এই কয় বছরের বাঙলার ইতিহাস এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

পাইক ও হাবসীদের সমর্থন নিয়ে সুলতান শাহজাদা বরবক শাহ নামে বাঙলার গদিতে বসলেন। কিছুদিন বাদে জলালের বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাশালী হাবসী নায়ক মালিক আন্দিল রাজধানী ফিরে আসেন। বরবক শাহ তাঁকে দিয়ে শপথ করান যে বরবক যতদিন মসনদে বসে থাকবেন ততদিন আন্দিল কিছু করবেন না। কিন্তু আন্দিল বরবকের উৎখাতের চেষ্টা করেন এবং দ্বিতীয়বারে সফল হন। তিনি জলালের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চাইলে জলাল-পত্নী আপত্তি করেন ও তাঁকেই সুলতান হতে বলেন। আন্দিল শামসুদ্দিন ফিরুজ নাম নিয়ে সুলতান হলেন। তাঁর রাজত্বের তিন বছরই (১৪৮৭—১৪৯০খ্রীঃ) বাঙলার কালিমাময় হাবসীশাসনের একমাত্র উজ্জ্বল অংশ। তিনি জনপ্রিয় সুশাসক হলেও শেষ পর্যন্ত পাইকদের হাতে মারা পড়েন। মনে হয় এই সময় পাইকরা যেন রাজা তৈরি করার বিধাতা হয়ে পড়েছে।

ফিরুজের পরে আরও দুজন হাবসী সুলতানের নাম আমরা পাই। শেষ জন শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। অবশেষে অতিষ্ঠ প্রজা ও প্রধানেরা বিদ্রোহ করে। এবং ১৪৯৩ সালে মুজাফ্ফরের মৃত্যুতে বাঙলার অরাজকতা ও হাবসীশাসনেরও শেষ হয়।

হুসেন শাহী বংশ

(১৪৮৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)

বাঙলার এই সংকটকালে সৈয়দ হুসেন নামে একজন বিদেশী, অধিকাংশের মতে আরবীয়, বাঙলার সুলতান হলেন। তাঁর পিতা বাঙলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের বাড়ি বোধহয় মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল। হুসেন শাহ সম্বন্ধে যত প্রচলিত গল্প-কাহিনী আছে তার সবগুলি থেকেই মনে হয় যে ছোটোবেলা থেকেই মুর্শিদাবাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ঠিক কি করে তিনি মুজাফ্‌ফরের উজির হয়েছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও বুদ্ধিকৌশল, বিচক্ষণতা ও জ্ঞান অনেকখানিই যে সহায় হয়েছিল তা ঠিক।

হুসেন সুলতান হলে বাঙলার মধ্যযুগের ইতিহাসে এক নতুন ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শুরু হল। হুসেন শাহী আমলে বাঙালী জনসাধারণের সৃষ্টিশীল প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ হয়। এই যুগেই বাঙলা ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করে আর এই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়েই তখনকার বাঙালী মনীষা আত্মপ্রকাশের পথ পায়। এই যুগেই বাঙলাদেশে স্থাপত্য-কলার বিকাশ হয়। শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিরাট সামরিক বিজয়-অভিযানের যুগও এইটাই। এই সময়েই চৈতন্যদেব বাঙলার সামাজিক ও মানসিক জীবনে এক নতুন স্রোতধারা বইয়ে দেন। এটা "বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। ভক্তির বাঁধনে

বাঁধা পড়ে বাঙালী জাতি অখণ্ড রূপ নিলে। বাঙালীর জীবনে এল নবজাগরণ। অধ্যাত্মচর্যায় আর সাহিত্যের অনুশীলনে এই জাগরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। আর পাই সঙ্গীতে, অর্থাৎ কীর্তনগানের বিকাশে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাগরণ দেখা দিত, যদি না ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান রাজশক্তির লোপ ঘটত। সংস্কৃতির দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্য প্রান্তীয় বাংলাদেশকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে দিলেন…।" বাঙলার এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে হুসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের দান অবিচ্ছেদ্যরূপে বাঁধা।

সুলতান হবার পরেই হুসেন কঠোর হাতে রাজধানী-লুণ্ঠনকারী সেনাদলকে দমন করেন। শোনা যায় তিনি নাকি আদেশ-অমান্যকারী বারো হাজার সৈন্যকে ফাঁসির হুকুম দেন। এরপর তিনি পাইকদের দল ভেঙে দেন। তাদের ক্ষমতা এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও তিনি হাব্‌সীদের প্রত্যেককেই বাঙলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পুরনো মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতদের ডেকে এনে উচ্চপদে চাকরি দেন। তাঁর রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায় যে তিনি বিভিন্ন জায়গায় সুদক্ষ জেলা-কর্মচারীদের পাঠান এবং সমস্ত অবিশ্বস্ত লোকজনদের অপসারিত করেন।

এরপর পশ্চিমের রাজনৈতিক ঘটনার জন্যে হুসেনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমে শারকী ও লোদীদের মধ্যে যুদ্ধ চূড়ান্ত অবস্থায় আসে এবং জৌনপুরের সুলতান হুসেন সিকন্দর লোদীর হাতে পরাজিত হন। হুসেন বাঙলাদেশে রাজসমাদরে আশ্রয় পান। সিকন্দর বাঙলার বিরুদ্ধে অভিযান করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি হুসেন শাহের সঙ্গে অনাক্রমণ ও সীমানানির্ধারণের জন্য একটি

চুক্তিতে আবদ্ধ হন। অল্পদিনের মধ্যেই হুসেন শাহ্ সারা উত্তর বিহার ও পাটনা পর্যন্ত সারা দক্ষিণ বিহারের অধিপতি হন।

১৫০০ সাল বা ঐরকম কোনো সময়ে কামরূপ রাজ্য বাঙলার সুলতানের অধিকারে আসে। তারপর হুসেন আসামের আহোম রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরমভাবে পরাজিত হন। আহোমরাজ্য দখল করতে না পারলেও কামরূপ বাঙলার অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল। এর পরে ১৫০৯ বা ঐরকম কোনো সময়ে হুসেনের সেনাপতি ইসমাইল গাজী উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতির সুযোগে উড়িষ্যার ভিতরে ঢুকে অনেক মন্দির ধ্বংস করে পুরী পর্যন্ত পৌঁছন। কিন্তু কোনো ভূখণ্ড এর ফলে বাঙলা রাজ্যভুক্ত হয় নি। এ-বিরোধ যে বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল তা নিশ্চিত। ১৫১৩ সালে ত্রিপুরার কিছু অংশ বহু লোকক্ষয় ও অন্যূন চারিটি অভিযানের পরে বাঙলা-রাজ্যের ভিতরে আসে। ঐ সময়েই হুসেনপুত্র নসরৎ শাহ্ ও সেনাপতি পরাগল খানের নেতৃত্বে আরাকান বিজিত হয়।

একমাত্র আসাম অভিযান ছাড়া হুসেনের সমস্ত অভিযানই সাফল্যপূর্ণ হয়। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হবার আগেই তিনি বাঙলার প্রাচীন সীমানার সমস্তটুকুই উদ্ধার করেন এবং কামরূপ, সরণ ও ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করে তা বাড়িয়েও যান। উত্তর-পশ্চিমে সরণ ও বিহার, দক্ষিণ-পুবে সিলেট ও চাটগাঁ, উত্তর-পুবে হাজো, দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারণ ও ২৪ পরগনা—এই বিশাল এলাকা জুড়ে বাঙলা রাজ্যের সর্বত্রই হুসেনের আমলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল। নিজে বিদগ্ধ ব্যক্তি হওয়ায় বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাবিস্তারে হুসেনের বেশ আগ্রহ ছিল। তাঁর সময়ে মালদা প্রভৃতি নানা জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

বাঙলার মধ্যযুগের সমস্ত শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ মহত্তম না হলেও শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। বাঙলাদেশের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টা সফল হবার ফলে বাঙালী তাঁর বিদেশী সত্তা ভুলে গিয়েছিল, এমনকি হিন্দু প্রজারা তাঁকে কৃষ্ণের অবতার হিসেবে গণ্য করত। প্রাচীন অভিজাতবর্গকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে তিনি দেখিয়েছিলেন, নতুন শাসক বাঙলার মসনদে বসলেও ইলিয়াস শাহী আমলের তুলনায় বাঙলার ঐতিহ্যে কোনো পরিবর্তনই হয় নি ও হবে না। হুসেনের নম্রতা, সৌজন্য ও দয়ালুতা বাঙালীর মনকে এতদূর আপন করে নিয়েছিল যে তাঁকে 'নৃপতিতিলক' ও 'জগৎভূষণ' বলা হত। স্বৈরাচারের ভারে নিপীড়িত, সমস্ত দিক থেকে অবরুদ্ধ, জাতি ও ধর্মবিদ্বেষে ছিন্নভিন্ন দেশকে তিনি শান্তি, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রনৈতিক গৌরব এনে দিয়েছিলেন, যা ইলিয়াসের আমলের পরে বাঙলাদেশ আর কখনও দেখে নি। অন্যান্য দিক থেকেও হুসেন খুব বড় ছিলেন। উদারচেতা হুসেন হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করে অবশ্য তাঁর পূর্বসূরীদের ধারা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তাদের অত্যন্ত গোপনীয় কার্যভার দিয়ে তিনি নিছক কূটনীতিরও বেশি কিছু করেছিলেন। তাঁর উজির গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, দেহরক্ষীদের নায়ক কেশব ছত্রী, টাঁকশালের অধ্যক্ষ অনুপ, সকলেই ছিলেন হিন্দু। গৌর মল্লিক তাঁর ত্রিপুরা অভিযানের সেনাপতি ছিলেন। রূপ ও সনাতনের নাম বাঙলার ইতিহাসে সুপরিচিত। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি হুসেনের অনুরাগ কম ছিল না। তাঁর রাজত্বকালে লেখা অধিকাংশ বইই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু মালাধর বসু, বিপ্রদাস,

বিজয় গুপ্ত ও যশোরাজ খাঁ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও উত্তর ভারতের অনেক মুসলমান রাজার মতো সংকীর্ণমনা ছিলেন না। হুসেনের দুর্ভাগ্য যে তাঁর পারিষদবর্গের মধ্যে একজন আবুল ফজল ছিলেন না। কিন্তু যেটুকু জানা যায় তাতে একমাত্র আকবরের সঙ্গেই তিনি তুলনীয়। বাঙলার সমস্ত মুসলমান নরপতিদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর নাম বাঙলার লোকস্মৃতিতে বহুদিন ধরে টিকে আছে।

হুসেনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ বাঙলার অধিপতি হলেন। পিতার জীবিতকালেই শাসনকার্যে অংশ নিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের তিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাছাড়া কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি অসাধারণ বিচক্ষণ ছিলেন।

কিন্তু উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। লোদী সাম্রাজ্য টলমল করছে। জৌনপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত ভূভাগ লোহানীদের নেতৃত্বে স্বাধীন। বাঙলার দরজা প্রায় খোলা। কিন্তু লোহানীদের সঙ্গে মিত্রতার সুযোগে তিনি বিহারে বাঙলার আধিপত্য আরও দৃঢ় করে তুলে পানিপথ-বিজয়ী বাবরের জয়ের ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বাবরের আক্রমণে জৌনপুর ও কনৌজ মোগল অধিকারে গেল। বাহার খান লোহানীর মৃত্যুতে পাঠান যুক্তফ্রণ্টে ফাটল ধরল। শের খান সুর দক্ষিণ বিহারে জায়গির পেয়ে সে ফাটল আরও বাড়িয়ে দিলেন নিজের স্বার্থের জন্য। কিছুদিন পরে অবশ্য মাহমুদ লোদী ও নসরতের যুগ্মচেষ্টায় আবার যে যুক্তফ্রণ্ট গড়ে

উঠল, তাতে শের খাঁও যোগ দিলেন। বাবরের বিরুদ্ধে যে ত্রিমুখী অভিযান শুরু হল তা পাঠানদের শক্তি ধ্বংস করল মাহ্‌মূদের নিজস্ব অপদার্থতার জন্য। শের খাঁ সমেত সমস্ত পাঠান নেতারাই বাবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। নসরতের অবস্থা তখন বিষম সংকটময়। অনেক টালবাহানা করার পর অবশেষে বাবরের সঙ্গে তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

কিছুদিন বাদে ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যুর পর নসরৎ আবার মাহ্‌মূদ লোদীর সহায়তায় পুরনো মোগলবিরোধী ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম হন। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে দাদরায় যে যুদ্ধ হয় তাতে পাঠানরা পরাজিত হন। এর জন্যে শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই বেশি দায়ী। এখন নসরতের আসল উদ্দেশ্য ও ভূমিকা আর লুকিয়ে রাখা গেল না। আত্মরক্ষার জন্য নসরৎ গুজরাটের বাহাদুর শাহের সঙ্গে এক মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলেন। হুমায়ুন তখনি বাঙলা অভিযান না করে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে মনোনিয়োগ করলেন।

ইতিমধ্যে নসরৎ আসাম আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পরে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য বারের মতো এবারও বাঙলার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজয় মানতে বাধ্য হল। বাঙলার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দুর্বল নৌশক্তি। কিন্তু কামরূপেও মুসলমান আধিপত্য বেশিদিন টিকতে পারল না। বাঙলার রাজনৈতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে কোচ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ আহোম ও মুসলমান উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে কুচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অধিকার করার পরেই কেবল মোগলসৈন্য আসাম আক্রমণ করতে সক্ষম হয়।

আততায়ীর হস্তে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয় (১৫৩২ খ্রীঃ)। তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনা সফল না হলেও পিতার নিকট থেকে যে বাঙলারাজ্য তিনি পেয়েছিলেন তা অটুট রেখে যেতে পেরেছিলেন। হুসেন শাহের মতো তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের দিকে তাঁর নজর ছিল। তিনি নিজেই মহাভারতের একটি বাঙলা অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁরই কর্মচারী ছুটি খাঁর উৎসাহের জন্যই শ্রীকর নন্দীর মহাভারত অনুবাদ আমরা পেয়েছি। তাঁর অন্য একজন কর্মচারী কবিরঞ্জন স্বয়ং বিখ্যাত কবি ছিলেন।

নসরতের পরে অল্পদিনের জন্য তাঁর পুত্র আলাউদ্‌দিন ফিরুজ সুলতান হন। মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করলেও তিনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর অনুরোধেই শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে বাঙলা কাব্য রচনা করেন।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজকে হত্যা করে তাঁর খুল্লতাত আবুল বদ্‌র্‌, গিয়াস্‌উদ্‌দিন মাহমূদ নাম নিয়ে সুলতান হন। মসনদে মাহমুদের অধিকার থাকলেও তিনি অনেক প্রতিপত্তিশালী নায়ককে বিরোধী করে তোলেন। হাজীপুরের শাসনকর্তা বিহারের শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে এক হয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করেন। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে নসরতের সুচিন্তিত পরিকল্পনা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে ব্যর্থ হয়। বিহারে লোহানীবংশ ও কোর খাঁ, মখতুম প্রভৃতিদের মধ্যে কোনো বনিবনা ছিল না। তাঁর উপর মাহমুদের অকর্মণ্যতা বাঙলা-দেশের অবস্থা আরও সঙীন করে তুলল। বিশেষ করে অস্থিরমতি লোহানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শের খাঁর সঙ্গে বিরোধ মাহমুদের অবস্থা আরও জটিল করে তোলে। মখতুমকে পরাজিত ও নিহত করলেও

শের খাঁর শক্তি বাড়ল ছাড়া কমল না এবং মখতুমের বিশাল ধনসম্পত্তি শের খাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করল। কিছুদিন বাদে লোহানীদের সহায়তায় ও বিহারকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করবার স্বপ্ন নিয়ে মাহমুদ শের খাঁকে আক্রমণ করলেন। সামরিক শক্তিতে হীনবল হলেও শের খাঁর রণচাতুর্য শেষ পর্যন্ত তাঁর গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ করল। এই পরাজয়ের ফলে ভৌগোলিক দিক থেকে বাঙলা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল আর শের খাঁ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

দুই পক্ষই এবার পরস্পরের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করতে শুরু করলেন। ১৬৩৬ সালে শের বাঙলা আক্রমণ করলেন। তেলিয়াগড়ী গিরিপথে প্রতিহত হবার পর শের অসীম সাহসে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আকস্মিকভাবে গৌড়ের একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মাহ্‌মুদ পোর্তুগিজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শের খাঁর এই কৌশলের ফলে ভীত হয়ে তিনি পোর্তুগিজদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে শের খাঁকে প্রচুর টাকা উপঢৌকন দিয়ে সন্ধি করেন। অথচ হাজী ইলিয়াস প্রভৃতির মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান হলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বর্ষার সময়ে শের খাঁকে সহজে পরাজিত করতে পারতেন। শের খাঁও নিজের অবস্থা বুঝে ধনসম্পত্তি নিয়েই ফিরে গেলেন। এর ফলে মাহ্‌মুদ একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। রাজমহলের পশ্চিমের সমস্ত ভূভাগ, বাঙলার দরজা তেলিয়াগড়ী সমেত, তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। বাঙলার স্বাধীনতা যায়-যায় অবস্থা। এ সবই মাহ্‌মুদের বিচক্ষণতার অভাব ও অদূরদর্শিতার ফল। তিনি শক্তিসঞ্চয়ের জন্য পোর্তুগিজদের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তারা বেশি সময় চাইতে লাগল।

শের খাঁ অবস্থা বুঝে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে আগেই বাঙলা আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ করলেন। হুমায়ুন যদি সোজাসুজি মাহ্‌মুদকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন তাহলে হয়তো ইতিহাসের গতি অন্যরকম হত। কিন্তু তা না করে তিনি চুনার অবরোধ করলেন। দক্ষ সেনাপতিদের হাতে গৌড়বিজয়ের ভার দিয়ে শের চুনারে ফিরে এলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন বাদে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে মাহ্‌মুদ সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি উত্তর বিহারে পালিয়ে গেলেন। ঠিক দুশো বছর বাদে বাঙলা আবার তার স্বাধীনতা হারাল (১৫৩৮ খ্রীঃ)।

অবশেষে মাহ্‌মুদ হুমায়ুনের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে শের খাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে প্রতিনিবৃত্ত করলেন। হুমায়ুন মাহ্‌মুদের সঙ্গে বাঙলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেষ গৌড়ে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে সেখানে কোনো আফগান সৈন্য নেই। শের খাঁ আগেই তাদের সরিয়ে নিয়েছে। আর যখন মাহ্‌মুদ জানলেন যে আফগানরা তাঁর দুই ছেলেকে খুন করেছে তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন ও অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। ফলে, স্বাধীন বাঙলার শেষ নিবু-নিবু দীপশিখাটিও নিবে গেল।

মাহ্‌মুদের স্বপক্ষে বোধ হয় বিশেষ কিছুই বলা যায় না। বাঙলার স্বাধীনতা বিলুপ্তির জন্য তাঁর অকর্মণ্যতা অনেকটা পরিমাণে দায়ী। তিনি একটি গৌরবময় বংশের সন্তান ও বিচক্ষণ বৈদেশিক নীতির উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু উভয়েরই অনধিকারী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রমাণ করলেন। পোর্তুগিজেরা তাঁর যে ছবি এঁকে গেছে, তা একজন আনন্দ-পিপাসু লম্পটের, যাঁর হারেমে হাজার হাজার নারীর অধিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনায় তিনি এমনি

কি সাধারণ জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আফগান প্রধানের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে যে সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা একজন রাজার পক্ষে নিছক অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার বশে তিনি শের খানকে ধ্বংস করার জন্য মোগলদের উপেক্ষা করেছিলেন। এ ব্যাপারে মাহ্মুদকে বিচার করবার সময় অবশ্য তাঁর প্রতিপক্ষের প্রতিভার কথাও মনে রাখতে হবে। সেই সময়ে সারা ভারতে রাজনৈতিক ধূর্ততা ও উপায়কুশলতায় শেরের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। কিন্তু প্রতিপক্ষরূপে শের খান না থাকলেও বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় মাহ্মুদ যে ধৃষ্টতা ও ভীরুতার পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙলার ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল। এমনকি হুমায়ুনের উপর একটি যুদ্ধে জয়লাভও শেষ পর্যন্ত হুমায়ুনের গৌড় অধিকার বন্ধ করতে পারত না।

আফগান শাসনে বাঙলা

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ শাহের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশ উত্তর ভারতের রাজমুকুট নিয়ে বিবদমান দুই পক্ষের, আফগান ও মোগল, জয়-পরাজয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠল। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে গৌড় বারকয়েক হাতবদল হল। ১৫৩৮ সালে বাঙলাবিজয়ের পরে শের খান স্বয়ং গৌড়ে আসেন বাঙলার স্থলতানদের বংশ-পরম্পরায় সঞ্চিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করতে। পোর্তুগিজদের হিসাব অনুসারে, আর এই হিসাব অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে মিলে যায়, শের খান গৌড় থেকে সোনার দামে ৬ কোটি মূল্যের ধনরত্ন নিয়ে যান। তাছাড়া হুমায়ুনের আসার খবর পেয়ে শের গৌড় পুরোপুরি লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেন। এই সংকটময় অবস্থার সময়ে গৌড় আরবী, হাবসী, আফগান, পোর্তুগিজ ও চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকদের ভাগ্যান্বেষণের আখড়া হয়ে ওঠে। ১৫৩৭ – ৩৮ সালে গৌড় আফগান-পোর্তুগিজ প্রভৃতি যোদ্ধা ও লুঠেরাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এরপর গৌড় হুমায়ুনের অধিকারে আসে। তিনি গৌড়ের সংস্কার ও পুনর্গঠনের দিকে যত্নবান হন। গৌড় তাঁকে এত মুগ্ধ করে যে তিনি মুগ্ধ হয়ে তার নতুন নাম দেন ‘জিন্নতাবাদ’ অর্থাৎ স্বর্গীয় নগর। কিন্তু শের খানের ক্ষমতাবৃদ্ধির সংবাদে হুমায়ুনকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল। বিহারের চৌসা নামক জায়গায় আফগান-মোগল সংঘর্ষে হুমায়ুন চরম পরাজয় বরণ করেন ও তাঁকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

চৌসার জয়ের পর ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শের খান আবার বাঙলা অধিকার করেন। কিছুদিন বাদে শেরকে বিলগ্রামে পুনর্বার মোগল-সেন্যর সম্মুখীন হতে হয় (১৫৪০ খ্রীঃ)। এবারেও হুমায়ুন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন এবং ভারতের রাজমুকুট পাঠানদের হস্তগত হল। ব্রিটিশ আমলে যেমন বাঙলাদেশ সারা ভারতের অধীশ্বর হবার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো সোপান হয়েছিল, তেমনি বাঙলার মসনদ, ধনরত্ন, সৈন্য, বিশেষ করে নৌবাহিনী শের খানকে ভারতেশ্বর শের শাহ্ হতে সাহায্য করেছিল।

দিল্লীর তখ্‌তে বসার কিছুদিন বাদেই ১৫৪১ সালে শের খানকে বাঙলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিরন্তন সমস্যা—সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রচেষ্টা—বাঙলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বাঙলার স্বাধীনতার ঐতিহ্য সে-সময়কার যোগাযোগের সুব্যবস্থার অভাবের সুযোগে আবার যেন জীবন পেল। সে সময় এই স্বাধীনতাস্পৃহা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেত বাঙলাদেশে। তাই বাঙলার রাজধানীকে বলা হত বুলঘাপুর, অর্থাৎ 'বিদ্রোহী নগর'। বাঙলার এই বাঁধনছেঁড়ার মনোভাব বাগে রাখবার উদ্দেশ্যে শের খান বাঙলাদেশকে অনেকগুলি ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিজের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এর সঙ্গে কিন্তু আকবরের আমলের সুবা বাঙলার উনিশটি সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এটুকু বলা চলে যে শেরের সৃষ্টি করা এইসব ছোটো ছোটো জায়গিরদারেরাই আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিরোধ-সংগ্রাম করেছিল। শেরের আমলের শান্তি বাঙলাদেশেও বজায় ছিল। ভারতের বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শুরু হয়েছিল বাঙলাদেশের

সোনারগাঁ থেকে। তবে প্রতি ক্রোশ অন্তর হিন্দু-মুসলমান পথিকের জন্য পৃথক সরাই ও মনখানেক সোনা নিয়ে বৃদ্ধার নিরুপদ্রবে যাতায়াত করা প্রভৃতি কাহিনী নেহাতই গালগল্প।

ষোলো শতকে বাঙলাদেশ, বিশেষত পূর্ববাঙলা, ভাগ্যান্বেষণের একটা প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। পাঠান, মগ ও পোর্তুগিজ সকলেই এখানে তাদের ভাগ্যপরীক্ষা করত। ইসলাম শাহের (১৫৪৫-৫৩ খ্রীঃ) শাসনকালে সুলেমান খান নামে একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত বাঙলায় আসেন। তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ভাটি অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম শাহের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। আর তাঁর দুই ছেলে ইসা ও ইসমাইলকে তুরানী বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেওয়া হয়।

শেষ আফগান স্থলতানগণ
(১৫৫৩-৭০ খ্রীঃ)

১৫৫৩ সালে ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর নয়া আফগান সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে এবং সর্বপ্রথমে বাঙলাই সাম্রাজ্য থেকে বিমুক্ত হয়। এই সময়ে বাঙলার স্থরবংশীয় শাসনকর্তা শামস্থদ্‌দিন মহম্মদ শাহ্‌ স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর ১৫৫৫ সালে শাহ্‌বাজ খান বাঙলার শাসক হন। কিন্তু শামস্থদ্‌দিনের ছেলে গিয়াস্‌উদ্‌দিন বাহাতুর শাহ্‌ শাহ্‌বাজকে পরাজিত করে নিজে বাঙলার মসনদ অধিকার করেন। এই সময়ে মোগল সৌভাগ্যসূর্য আবার প্রকাশ পায়। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ সালে আকবর দিল্লীর মসনদে বসলেন। গিয়াস্‌উদ্‌দিনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে স্থলতান হন (১৫৬০ খ্রীঃ)। তিনিও ১৫৬৩ সালে মারা যান। তারপর তাঁর শিশুপুত্রকে হত্যা করে তাজ খান কর্‌রানি বাঙলার রাজমুকুট লাভ করলেন।

কর্‌রানি-বংশীয় স্থলতানেরা ছিলেন ভাগ্যান্বেষীর দল। নানা কৌশলে ও ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে তাঁরা বাঙলার মসনদ লাভ করেন। তাজ খান স্থলতান হবার এক বছর বাদে মারা গেলে তাঁর ভাই স্থলেমান স্থলতান হন। তিনি আট বছর স্থলতানি করেন (১৫৬৫-১৫৭২ খ্রীঃ)। এই বংশের অধীনে বাঙলাদেশ অসীম শক্তি-সম্পন্ন হয়। সারা উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙলার সমকক্ষ তখন কেউ ছিল না। স্থলেমানের নেতৃত্বে বিশাল ভূভাগ, সৈন্যসামন্ত ও ধনরত্ন বাঙলায় জমা হয়। প্রজা-শাসনে ও পালনে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ

দিতেন। প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। ইসলামধর্ম চর্চা ও বিদ্যার প্রসারে তিনি সাহায্য করতেন। সুলেমান মোগলসম্রাটের বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করতেন না। পূর্বাঞ্চলের মোগল শাসনকর্তাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন নি। আকবরকে সম্রাট হিসেবে প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের আচরণ ছিল স্বাধীন রাজার মতোই। এসবের মূলে অবশ্য ছিলেন সুলেমানের বিচক্ষণ উজির লুদি খান।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যুর পর বাঙলায় গৃহবিবাদ শুরু হয়। অবশেষে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ বাঙলার সুলতান হন। আত্মগর্বী দাউদ আকবরের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করলেন। অদূরদর্শিতা, বুদ্ধিহীনতা ও সন্দেহবশে তিনি পাঠান প্রধানদের বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়েন। অবশেষে লুদি খানকেও তিনি বিরোধী করে তুললেন। কিছুদিন বাদে দাউদ লুদি খানকে হত্যা করায় পাঠানেরা তাঁর আরও বিরোধী হয়ে ওঠে।

১৫৭৫ সালে আকবর মুনিম খানের সঙ্গে বিহার-বাঙলা অভিযানে বেরুলেন ও দাউদকে পরাজিত করে পাটনা দখল করলেন। দাউদকে অনুসরণ করে মুনিম খান অবশেষে ঐ বছর সেপ্‌টেম্বর মাসে বাঙলার রাজধানী টাণ্ডা অধিকার করেন। দাউদ পালিয়ে উড়িষ্যায় চলে যান। মোগলেরা প্রথমে তাঁকে অনুসরণ করে নি। তোডরমলের পরামর্শে মোগল সৈন্য দাউদের পশ্চাৎধাবন করে এবং ১৫৭৬ সালের মার্চ মাসে তুকারোই-এর যুদ্ধে দাউদের পরাজয়ের ফলে বাঙলাদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হল। বাঙলার স্বাধীনতা আর-একবার নষ্ট হল।

মোগল ছত্রচ্ছায়ায় বাঙলাদেশ

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় নি। পশ্চিম ভারত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মোগল আক্রমণে বিধ্বস্ত পাঠান নায়কেরা পুব দিকে হটে যেতে যেতে বাঙলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁরা বহুদিন মোগল আধিপত্য প্রতিরোধ করে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও বাঙলার অধিবাসী-দের মধ্যে আর-একটি নতুন ধারা যুক্ত হয়। প্রাকৃতিক কারণে আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য বাঙলাদেশ সমস্ত শাসকদেরই শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। শের শাহ্ বাঙলা জয় করেন ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙলার শেষ আফগান সুলতান রাজ্যত্যাগ করেন ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আর শেষ স্বাধীন আফগান প্রধান সিলেটে নিহত হন ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে কিন্তু ভিন্ন্ প্রদেশ থেকে আসা আফগান নায়ক এবং স্থানীয় শাসকদের বংশধরদের সৃষ্ট অনেক ছোটো-খাটো জায়গিরে বাঙলাদেশ ভরে যায়। এই পলাতক পাঠানদের স্রোত উত্তর-পুবে সিলেট এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়। এর জন্যেই আমরা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে গজনভী, পানি, ইউসুফজাই, সুর প্রভৃতি আফগান কৌম-নাম আজও পাই।

দাউদ কররানির পরাজয়ের ফলে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় মোগল-শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ নুর-উদ্-দিন জাহাঙ্গীর ইহলোক ত্যাগ করেন। এই দুই তারিখের মধ্যবর্তী

সময়েই বাঙলাদেশে মোগল-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বাঙলাদেশে মোগল-শাসন টিকে থাকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে আওরঙ্গজেব-এর মৃত্যু পর্যন্ত। তার পর বাঙলা আবার স্বাধীন হয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। মুরশিদ কুলি খান নামে-মাত্র দিল্লীর বাদশাহের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই বাঙলার নবাবী আমলের সূত্রপাত, আর পলাশির যুদ্ধে নবাবদের তথা বাঙলাদেশের স্বাধীনতারও সমাপ্তি।

বাঙলাদেশ আকবর কিন্তু একবারে জয় করতে পারেন নি। আফগান প্রধানেরা সহজে মোগল আধিপত্য মেনে নেন নি। কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী হবার জন্য বাঙলার উপর নজর রাখা ছিল বেশ কঠিন। প্রায়ই পাঠান নায়কেরা বিদ্রোহী হতেন।

১৫৮৬ সালের নভেম্বর মাসে আকবর মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুবার শাসনপদ্ধতি চালু করেন। একজন শাসনকর্তা বা 'সিপাহ্ সালার', একজন উপ-শাসনকর্তা, একজন রাজস্বমন্ত্রী বা 'দেওয়ান', একজন সেনাবাহিনীর প্রধান পরিদর্শক বা 'বখ্শি', একজন দেওয়ানি বিচারক, একজন 'কাজী' বা ফৌজদারী বিচারক, একজন পুলিসের অধিকর্তা বা 'কোতোয়াল' প্রত্যেক সুবায় নিযুক্ত হন।

বাঙলার প্রথম সিপাহ্ সালার ওয়াজির খান শিগগির মারা যাওয়ায় কিছু করতে পারেন নি। সইদ খানও চারপাশের বিরোধিতা দমনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন নি। বাঙলাদেশে মোগল শক্তির সুপ্রতিষ্ঠা ও শান্তি আসলে শুরু হয় ১৫৯৪ সালে। ঐ বছর রাজা মানসিংহ শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং যুবরাজ সলিমের পাঁচ হাজার সৈন্য বাঙলাদেশে জায়গির পায়। ১৫৯৫ সালে মানসিংহ রাজ-মহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানী থেকে ভাটির পাঠানদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেন এবং ১৫৯৬ সালে কোচরাজ্যকে করদরাজ্যে পরিণত করেন। এইভাবে বাঙলাদেশের বড়ো অংশ মোগল অধিকারে আসায় মোগল শক্তি দৃঢ় হয় এবং বাঙলা শান্তির মুখ দেখে।

১৬০৮ সালে জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ হন। ঐ বছরই ইসলাম খান সিপাহ্ সালার হন। পাঁচ বছরের শাসনকালে তিনি মানসিংহের আরব্ধ কাজ প্রায় সমাপ্ত করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম, পাঁচেট ও হিজলির জমিদারেরা অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের জায়গির রাখবার অনুমতি পান। তারপর ইসলাম খান পূর্ববঙ্গের দিকে নজর দেন। ভুঁইয়া ও জমিদারেরা একের পর এক পরাজয় বরণ করেন। ভূষণার রাজা সত্রাজিত সবার আগেই মোগল আধিপত্য স্বীকার করেন। তিনি মোগলদের অধীনে কাজ নেন ও তাঁর জায়গির ঠিক থাকে। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ইশা খানের পুত্র মুসা খান ও তাঁর সমর্থকেরাও আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁদের জায়গির রাখতে দেওয়া হলেও দরবারে নিজেদের উপস্থিত থাকতে হত এবং তাঁদের উপর নজর রাখা হত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাক্‌লা ও যশোহরও সিপাহ্ সালারের সরাসরি শাসনাধীনে আসে। এরই মধ্যে বিদ্রোহী পাঠানদের প্রধান নেতা খাজা উসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং সিলেটের আফগান নায়ক বায়িজিদের পরাজয়ে পাঠানদের প্রতিরোধও শেষ হয়ে যায়। ঐ বছরই বাঙলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বাঙলার সমস্ত ভূভাগই তখন মোগলদের সুদৃঢ় অধিকারভুক্ত। জনসাধারণ বহুদিন বাদে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ ও তার আনুষঙ্গিক ফলাফলের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পরবর্তী শাসনকর্তা* কাশিম খানের (১৬১৩-১৭) অকর্মণ্যতার ফলে নতুন করে বাঙলাদেশে গোলমাল দেখা দিল। বীরভূম, পাঁচেট, হিজলি ও চন্দ্রকোণার জমিদারদের অবশ্য তাড়াতাড়িই বশে আনা সম্ভব হয়। বাঙলার সীমান্তের রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলত এবং অনেক সময় মোগল সৈন্যেরা পরাজিত হত।

১৬১৭ সালে ইব্রাহিম খান সুবাদার হয়ে আসবার পর ১৬২৩ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। আর একবার বাঙলার মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা ও আর্থিক সমৃদ্ধি উপভোগ করল। জমিদারেরা সুবাদারের বন্ধুত্বপূর্ণ নীতির ফলে উপকৃত হলেন। বহু-ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের জমিদারি ফিরে পেলেন। কিন্তু কতকগুলি শান্তিভঙ্গকারী ব্যাপার যা ঘটেছিল তার সমগ্র ফল কিন্তু নেহাত কম ছিল না। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দেই চন্দ্রকোণার বীর ভান-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়। কারণ তিনি নাকি তাঁর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাতায়াতকারী পথিকদের বিশেষ বিড়ম্বিত করছিলেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা অধিকৃত হয় এবং ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান-রাজের আক্রমণ পর্যন্ত বাঙলায় শান্তি বিরাজমান ছিল। তিনি নৌপথে একেবারে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন দুধারের গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করতে করতে। চাটগাঁ দখল করবার প্রচেষ্টা আর-একবার ব্যর্থ হল (১৬২১খ্রীঃ)। ফলে মগেরা সাহস পেল। দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় বিদেশী ফিরিঙ্গি দস্যুদের আক্রমণ আগের মতোই চলতে লাগল। ঐ সময়েই হিজলির জমিদারের বিদ্রোহ বিরাট আকার নেয় এবং বহু কষ্টে তা দমন করতে হয়।

১৬২৪ সালে এল শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ আর সাময়িকভাবে তাঁর বাঙলা অধিকার। বাঙলার অসন্তুষ্ট লোকদের ভিতর তিনি

অনেক বন্ধু খুঁজে পেলেন। ফলে বাঙলাদেশ যে গৃহযুদ্ধের রণভূমি হয়ে ওঠে তাতে ইব্রাহিম খান মারা যান। সমস্ত শাসনব্যবস্থাই প্রায় ওলটপালট হয়ে যায়। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মহাবতখানের সুবাদারি তেমন কোনো উন্নতি আনতে পারে নি। কারণ, মহাবত খান রাজধানীতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার ফলে মগেরা ঢাকা শহরও লুণ্ঠন করতে সক্ষম হয়। মারা যাবার কয়েকমাস আগে জাহাঙ্গীর ফিদাই খানকে (মার্চ, ১৬২৭) বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তাঁর একটি শর্ত ছিল যে বাঙলাদেশ থেকে উপহার হিসেবে সম্রাটের জন্য পাঁচ লাখ এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জন্য সমপরিমাণ মুদ্রা দিল্লীতে প্রতি বছর পাঠাবেন। স্পষ্টতই বাঙলায় শান্তি আর সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিও ফিরে আসছে। জাহাঙ্গীরের শাসনের বাইশ বছর বাঙলার ইতিহাসে গঠনের সময় বলা যেতে পারে। মোগল বাঙলার পরবর্তী কালের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি এবং যে ধারায় বাঙলার রাজনৈতিক জীবন ও বৈদেশিক সম্পর্ক চলছিল তার প্রধান ঝোঁকগুলি প্রধানত এই যুগেই নির্ধারিত হয়। কয়েকজন ক্ষমতাবান সুবাদারের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ বাঙলাদেশ একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহুকাল বাদে বাঙলা আবার একটি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য উপভোগ করতে পারে। এর ফলে অন্তত আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাঙলার রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট খাত বেয়ে চলে। এই যুগে তাই নিরবচ্ছিন্ন আভ্যন্তরিক শান্তি বজায় ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ যা হয়েছে তা প্রান্তশায়ী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধেই। ফলে যে বাঙলাদেশকে আমরা চিনি, পোর্তুগিজ ব্যবসাদারী আর ইংরেজ শাসনদণ্ড বাদ দিয়ে, তা এই সময়েই রূপ পায়।

শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ॥ শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনের সুদীর্ঘ আশি বছরে বাঙলাদেশের ইতিহাসে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। তবু আগের তুলনায় দুটি নতুন জিনিস এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। একটি বাঙলার দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরিক শান্তি। একমাত্র সীমান্তের পরে অবস্থিত জমিদারদের শায়েস্তা করার জন্যে তাদের সঙ্গে দু-একটি ছোটোখাটো সংঘর্ষ ছাড়া কোনো বিদ্রোহ এই সময়ে দমন করতে হয় নি, কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিরোধ করতে হয় নি। আর-একটি সীমান্তের ওপারে বিজয়-অভিযান। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আসাম বিজয়ের চেষ্টা শুরু হয়, ১৬৬২ সনে আসাম জয় এবং ১৬৮২ সনে মোগলদের আসাম ত্যাগ। আসাম ত্যাগ করার পর থেকেই মোগল সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে। ভারতের সর্বত্রই স্থানীয় শাসনকর্তারা স্বাধীনতালাভে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। দক্ষিণে মারাঠাশক্তির অভ্যুদয় মোগল শক্তিকে হীনবল করে তোলে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশের তদানীন্তন শাসনকর্তা মুরশিদ কুলি খান (১৭০৩-১৭২৭ খ্রীঃ) কার্যত স্বাধীন নবাবের মতোই বাঙলার শাসন পরিচালনা করতে থাকেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালের একটি প্রধান ঘটনা হল পোর্তুগিজদের সঙ্গে সংঘর্ষ। আর আওরঙ্গজেবের আমলে দেখা গেল ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের আধিপত্যের সূত্রপাত।

শাহজাহানের আমলে বাঙলার সুবাদার শায়েস্তা খান চাটগাঁ, আরাকান, সন্দ্বীপ অধিকার করে ফিরিঙ্গি, হারমাদ ও মগদস্যুদের উৎপীড়ন থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলার অধিবাসীদের জীবন নিরুপদ্রব করেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। এই সব পোর্তুগিজ ভাগ্যান্বেষী ও তাদের

জারজ সন্তানেরা তখন আর পোর্তুগীজ সরকারের প্রতিনিধি ছিল না, তখন তারা নিছক জলদস্যু ও দাস-ব্যবসায়ী, দক্ষিণ বাঙলার ত্রাস— হারমাদ।

মোগল শাসনে বাঙলা ॥ মোগল আমলে বাঙলাদেশে যে-পরিবর্তন আসে তার মোটামুটি পরিচয় অল্পের মধ্যে দেওয়া কঠিন।

মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় বাঙলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়। একই আইনকানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সারা দেশে চালু হয়। ফলে বাঙলাদেশ কতকগুলি দিকে খুব উন্নতি করে। বাঙলাদেশ তার বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উত্তরভারত এবং বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রাচীন কাল থেকেই অবশ্য এই যোগ ছিল। মাঝে মাঝে তা ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু একেবারে ছিঁড়ে যায় নি। এই যোগাযোগ স্থাপনের ও বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম কারণ বিপুল এক সমুদ্র-বাণিজ্যের অভ্যুদয়। এই বাণিজ্যের উন্নতি বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি যেমন আনে, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর জীবন ও চিন্তা-ধারায়ও নতুনের আভাস আভাসিত করে। প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রবাণিজ্যে বাঙালী এগিয়ে ছিল। কিন্তু ষোলো শতক থেকে তা ক্রমশ বিপদসংকুল হয়ে ওঠে এবং মোগল আমলে এই সমুদ্রবাণিজ্যে বাঙালীর নিজস্ব কোনো সম্মান বা শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। এর সবটাই সে সময় বিদেশী পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ বণিকদের করতলগত ছিল। বহির্বাণিজ্যে বাঙালীর হাত না থাকলেও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন বাঙলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে উঠতে থাকে। বিদেশী রৌপ্যের আগমনের ও বিদেশী বণিকদের দ্বারা কিছুটা সংঘবদ্ধ হওয়ায় তার পরিমাণগত, এমনকি

গুণগত উন্নতিও হল অসাধারণ এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হারমাদ দস্যুদের উৎখাতের পর এই উন্নতি বিপুল পরিমাণে বেড়ে চলে। এই নতুন বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার মূলও ধ্বংস করতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এইভাবে বাঙলাদেশ বিপুলা এ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হল। একদিকে মোগলসাম্রাজ্যের অন্যতম সুশাসিত সুবায় কেন্দ্র থেকে দলে দলে রাজকর্মচারী, বণিক, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, কারিগর ও সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি আসতে লাগল। অন্যদিকে তেমনি বাঙলাদেশ থেকে বৈষ্ণব ভক্ত ও গুরুর দল পশ্চিমে বৃন্দাবন, এমনকি জয়পুর-কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত যেতে লাগল। অনেক বাঙালীও আজকের মতোই দিল্লী যেতে লাগলেন দিল্লী-আগ্রার রাজদরবারে নিজের ভাগ্যপরীক্ষায়। বহু শতাব্দী বিস্তৃত বাঙলার বিচ্ছিন্নতা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ভেঙে গেল। বাঙলা আবার ভারতের অন্যতম অংশ হয়ে উঠল সর্বভারতীয় জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে।

মোগল আমলের শেষ ভাগে বাঙলার ইউরোপীয় বসতিগুলি—হুগলি (১৬৫০), কলকাতা (১৬৯০), চন্দননগর (১৬৯০)—সতেরো শতকের শেষে মোগল রাজ্যের বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট ধনীদরিদ্রের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে; আর এঁরাই পরবর্তী কালে নতুন সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকে মিশনারিদের কার্যকলাপ আমরা জানি আর তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করি। কিন্তু সতেরো শতকের পোর্তুগিজ মিশনারিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানি না। বাঙলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বেশ কিছু শব্দ জোগানো ছাড়া বাঙলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কোনো পোর্তুগিজ প্রভাবই নেই। যেসব

পোর্তুগিজ সংকর বংশধর রেখে গিয়েছিল বা যারা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা না ভারতের না খ্রীষ্টধর্মের গৌরবের নিদর্শন।

মোগল শাসনে বাঙলার সমগ্র ধর্মজীবন রূপান্তর গ্রহণ করে। এই রূপান্তর আনে বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মের এই প্রভাবের কারণ শুধু চৈতন্যদেব নন। নিত্যানন্দ ও সাত গোস্বামী চৈতন্যের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে যে-সংগঠন ও দার্শনিকতত্ত্ব খাড়া করেন তাই এই প্রভাবের কারণ। বৈষ্ণব ধর্মের ও চিন্তার প্রসারে বাঙলাদেশে শক্তিপূজার ব্যাপ্তি ও প্রভাব খুবই কমে আসে। শক্তিপূজা বা তান্ত্রিক ধর্ম বাঙলার প্রায় অধিকাংশ জায়গা থেকেই বিলোপ পায় বা প্রাচীন তান্ত্রিকধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যমুক্ত হয়।

বৈষ্ণব গোসাঁইরা বাঙলার আপামর জনসাধারণের কাছে যে শুধু প্রেমের বাণী পৌঁছে দিলেন তাই নয়। সেই সঙ্গে তাঁরা বাঙলাদেশে সংস্কৃতচর্চা পুনরুজ্জীবিত করলেন। বৈষ্ণব শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেও এক নতুন যুগের সূত্রপাত করল। বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

সংস্কৃতচর্চার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী আর-একটি বিদেশী সংস্কৃতিও আত্মসাৎ করতে থাকে। মোগল দরবারের সমস্ত কাজকর্মই ফারসী বা পারসিক ভাষায় হত। সেরেস্তার হিন্দু কর্মচারীরা ও দরবারের উচ্চপদস্থ হিন্দুরাও ফারসী শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মুরশিদ কুলি খানের আমলের আগে বাঙালী হিন্দুরা মোগল দরবারে তেমন প্রতিপত্তিশালী হতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ফারসী সংস্কৃতি আস্তে আস্তে মোগলদরবার থেকে হিন্দু রাজসভাতেও

অনুপ্রবেশ করে এবং বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিতে ছাপ রেখে যায়। বাঙালীর ফারসী শিক্ষার আর-একটি ফল দেখা যায় সুফীধর্মের প্রসারে ও সুফীচিন্তার প্রভাবে।

সতেরো শতকের শেষভাগে বাঙলার মুসলমান সমাজেও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। ইরান প্রভৃতি দেশ থেকে উৎপীড়িত শিয়া মুসলমানেরা বাঙলাদেশে আশ্রয় নিতে থাকেন। শিক্ষিত ও গুণী শিয়া পণ্ডিতদের আগমনে বাঙালী মুসলমান সমাজও পরিবর্তিত হতে থাকে।

বারো ভুঁইয়া ॥ বাঙলার ইতিহাসের একটা বড়ো সমস্যা বহুদিন ছিল বারো ভুঁইয়াদের নিয়ে। বাঙালীর দেশপ্রেম ও জাত্যভিমান বারো ভুঁইয়াকে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষাকারী হিসেবে তাঁদের চিত্রিত করেছে। আসলে তাঁরা সেরকম কিছুই ছিলেন না। তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন হঠাৎ-গজানো রাজা, যাঁরা নিজেরা বা মাত্র একপুরুষ আগে বাঙলার ভঙ্গুর কররানি সাম্রাজ্যের এক-একটা অংশ অধিকার করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজা হয়ে বসেছিলেন। এঁরা আসন গেড়েছিলেন বিশেষ করে যশোর-খুলনা-বরিশালের দুর্গম সমুদ্রশায়ী অঞ্চলে, ঢাকায় ব্রহ্মপুত্রের ওপারে এবং উত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেটের দূর জঙ্গলাকীর্ণ দেশে।

বারো ভুঁইয়াদের ত্রিপুরা, কামরূপ বা কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে এক করা ভুল। ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজারা ছিলেন বংশপরম্পরায় অধিষ্ঠিত 'জন'-নেতা। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ইশা খান বা আনোয়ার গাজী কেউই কোনো প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু রাজবংশের কুলতিলক ছিলেন না। খুব বেশি হলে তাঁরা ছিলেন ভুঁইফোড় জমিদার, যাঁরা যে-কোনো ক্ষমতাবান নৃপতিকে কর

দিয়ে নিজের জমিদারি বজায় রাখতে পারলে খুশি হতেন। বাঙলায় কেন্দ্রীয় শাসনলোপই এইসব 'রাজা'দের অপরের রাজ্যদখলে উৎসাহিত করে। আফগান সাম্রাজ্যের পতন ও মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী টালমাটালের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে এঁদের উৎপত্তি। মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠার পরেই এঁদের অস্তাচল গমন। আর মোগলরা বিদেশী হলে কররানি ও লোহানিরাও বিদেশী এবং একমাত্র পাল রাজারা ছাড়া আর কোনো জাত-বাঙালী কখনো বাঙলাদেশ শাসন করে নি।

বাঙলায় পোর্তুগিজ

ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্যই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা নতুন বাজারের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে পোর্তুগিজরা ছিলেন অগ্রণী। এই রকম একটি অভিযানের ফলেই ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার। দা-গামা কালিকট বন্দর পর্যন্ত পৌঁছেই শান্ত হয়েছিলেন। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙলার খবর পেয়ে এবং এতদ্দেশীয় অন্যান্য বণিকদের হাত থেকে বাঙলার সমুদ্র-বাণিজ্যাধিকার নিজেদের হাতে নেবার জন্যে তাঁরা চাটগাঁর শাসনকর্তার কাছে লোক পাঠালেন দুজন। একজন—দোম জোয়াও দ সিলভেইরা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে চারখানা জাহাজ নিয়ে পথে দুটি বাণিজ্যপোত দখল ও মাল লুট করে চাটগাঁয়ে পৌঁছলেন। আর আরেকজন—কোয়েলহো—অন্য-একটি মুসলমান জাহাজে যাত্রী হিসাবে সিলভেইরার কিছুদিন আগে এসে পৌঁছন। কোয়েলহোর আচারব্যবহারে চাটগাঁর শাসনকর্তা তুষ্ট হলেও সিলভেইরার কার্যকলাপ পোর্তুগিজদের সমস্ত চেষ্টাকে সঙ্গত কারণেই ব্যর্থ করে দেয়।

১৫২৬ ও ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার পোর্তুগিজেরা চাটগাঁয় যান। কিন্তু এদেশী বণিকদের জাহাজ লুট করায় কোনো ফল হয় না। অবশেষে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপত্তিশালী মুসলমান বণিক শিহাবুদ্দিনের সাহায্যে চাটগাঁয় ফ্যাক্টরি ও দুর্গনির্মাণের অনুমতি লাভের

উদ্দেশ্যে দ মেলো বাঙলায় আসেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর বুদ্ধি সাফ হয় না। বন্দরশুল্ক ফাঁকি দিতে চান বেআইনিভাবে মাল পাচার করে, আর আসল মালিকের লেবেল না তুলেই চোরাই মাল দিয়ে খুশি করতে চান সুলতানকে। সুলতান স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হয়ে পোর্তুগিজদের ডাকাতির অভিযোগে বন্দী করেন। এই খবর পেয়ে পোর্তুগিজ ভারতের শাসনকর্তা নুন্না দা কুন্হা পোর্তুগিজ শক্তির এতবড়ো অপমান কি করে সহ্য করেন! তাই ১৫৩৪ সালে দা সিলভা মেনেজেস এক শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে চাটগাঁ পৌঁছে সুলতানকে প্রতিবাদপত্র পাঠান। এক মাস হয়ে গেল অথচ জবাব আসে না। কাজেই তিনি চাটগাঁ শহর আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের তলোয়ারের ডগায় ঝুলিয়ে দেন। ব্যাপারটা দুপক্ষের সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলল। ১৫৩৫ সালে দিওগো রেবেলো সাতগাঁ পৌঁছে শান্তিপূর্ণ অবরোধের চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে সুলতানের অবস্থার পরিবর্তন হয়। শের খান সুরের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি পোর্তুগিজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে কিছু না হলেও শের যে শেষ পর্যন্ত বাঙলা দখল করবেনই তা জানা কথা ছিল। পোর্তুগিজেরা সাহায্য করতে অক্ষমতা জানাল। ইতিমধ্যে সাতগাঁ ও চাটগাঁয় কারখানা বানাতে পোর্তুগিজরা অনুমতি পায়। শের বাঙলাদেশ সম্পূর্ণ দখল যখন করলেন তখন পোর্তুগিজরা ঐ দুই জায়গায় নিজেদের কাস্টম্‌স হাউস তৈরি করে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

এর পরের বছর কুড়ির পোর্তুগিজ ইতিহাস একেবারেই অন্ধকার বলা চলে। কিন্তু তাই বলে পোর্তুগিজ বণিকেরা চুপচাপ বসে ছিল এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের বাণিজ্য-

পোতসমূহ পূর্ব বাঙলার বন্দরগুলিতে যাতায়াত করত। আর এটাও নিঃসন্দেহ যে পোর্তুগিজ ক্যাপটেনরা ব্যবসার স্বাভাবিক লাভ দস্যুতা করে আরও বাড়াতেন।

১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগিজেরা বাকলা-রাজ (দক্ষিণ বরিশাল) পরমানন্দর সঙ্গে বাকলার ভিতর ব্যবসাবাণিজ্য করবার জন্য মৈত্রী-চুক্তি করে। শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয় না। বাকলারাজকে সামরিক সাহায্যও করবার জন্যে পোর্তুগিজরা সম্মত হয়। পরিবর্তে বাকলারাজ নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বা চাল, মাখন, তেল, চিনি প্রভৃতি দিতে সম্মত হন। স্পষ্টতই স্থানীয় রাজাদের দুর্বলতা ও উচ্চাশার সুযোগ নিয়ে পোর্তুগিজেরা এইসব বাণিজ্য পুরোপুরি নিজেদের করায়ত্ত করতে চায়।

পরমানন্দর পরে তাঁর ছেলে রাজা রামচন্দ্রের (প্রতাপাদিত্যের জামাই) আমলে পোর্তুগিজ মিশনারিরা বাকলায় আসতে শুরু করেন। খুব সহজেই তাঁরা গির্জা তৈরি ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি পান। একটা বড়ো কারণ বোধহয় বাকলারাজের সেনাদলে একজন পোর্তুগিজ ক্যাপটেন ছিলেন এবং আরো অনেক ভুঁইয়াদের মতো তিনিও নিজের নৌবাহিনীতে প্রচুর পোর্তুগিজ সৈন্য ও সেনানায়ক নিয়োগ করতেন। এইসব পোর্তুগিজ ভাগ্যান্বেষীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী উত্তরসূরীদের মতো নিজের দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী বহু ভাগ্যান্বেষীর মতোই তাঁরাও যে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের পকেট ভরতি করেছিলেন তা নিঃসন্দেহ। পোর্তুগিজ ও পোর্তুগিজ-ভারতীয় বোম্বেটেরাই বাঙলার ইতিহাসে হারমাদ নামে বিখ্যাত হয়েছে। তাদের নির্বিচার নরনারী হরণ,

লুণ্ঠন ও অত্যাচার দক্ষিণ বাঙলার ইতিহাসের করুণ ও ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়। এই দাস-ব্যবসায় তাদের ধনলাভের অন্যতম উপায় ছিল।

গনজালেস নামে এক দস্যুর অধিনায়কত্বে পোর্তুগিজ ও ভারতীয় এক দস্যুদল সন্দ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে বছর দশেক অবাধে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করার পর ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের হাতে ধ্বংস হয়।

সন্দ্বীপ হাতছাড়া হয়ে গেলেও পোর্তুগিজরা বাঙলাছাড়া হল না। সারা দেশেই তাদের বড়োছোটো অনেকগুলো বসতি ছিল। তাদের সাহস ও বীর্য বাঙলার প্রায় সব ভুঁইয়াদের দরবারেই তাদের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল। বাকলা (বরিশাল), চণ্ডিকান (যশোর), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালি) ও কাতরাবো (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) প্রভৃতি রাজ্যে অনেক পোর্তুগিজ বসতি ছিল। যশোর রাজ্যেই বাঙলার প্রথম খ্রীষ্টীয় গির্জা তৈরি হয়।

পূর্ববঙ্গে যেমন চাটগাঁ ছিল পোর্তুগিজদের বড়ো বন্দর তেমনি পশ্চিমবঙ্গে সাতগাঁ ছিল তাদের ছোটো বন্দর। সাতগাঁ তখনকার দিনের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে আস্তে আস্তে সাতগাঁর বিশাল নদী মরে হেজে যেতে থাকে। সেজন্য স্থানপরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে একজন পোর্তুগিজ পাদরি ফাদার জুলিয়ানো পেরেইরা ও জনৈক বৈষয়িক ব্যক্তি পেদ্রো তাভারেস সম্রাট আকবরের কাছ থেকে হুগলিতে কারখানা ও কাস্টম্ হাউস সরিয়ে নিয়ে যাবার ফরমান পান। অল্পদিনেই হুগলি জমজমাট হয়ে ওঠে। আকবর ও জাহাঙ্গীর আশা করেছিলেন যে পোর্তুগিজেরা নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি নিয়েই থাকবে আর তাদের সশস্ত্র নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে পাহারাদারের কাজও করবে। সেজন্যে তাঁরা তাদের বিশেষ বিব্রত করতেন না। পোর্তুগিজেরা মহানন্দে নিজেদের ব্যবসা এবং লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে নানা কারণে শাহজাহানের আমলে মোগল সৈন্য হুগলি আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে (১৬৩২ খ্রীঃ)। হুগলির পতন বাঙলাদেশে পোর্তুগিজের পতনের সূচনা। চাটগাঁর পোর্তুগিজ কলোনি আওরঙ্গজেবের আমলে উৎখাত হয়। কিন্তু বাঙলাদেশে আজও পোর্তুগিজ সম্প্রদায় টিঁকে আছে। কলকাতা ও হুগলি, ঢাকা ও চাটগাঁয় পোর্তুগিজ-ভারতীয় নাগরিকেরা এখনো অতীতের সঙ্গে একটা যোগ বজায় রেখেছে বটে কিন্তু পূর্ব-পুরুষদের সে দিন আর নেই।

পোর্তুগিজদের বাঙলায় আগমন ও বসবাসের ইতিহাস মোটের উপর কলঙ্কিত হলেও কিছু কিছু উজ্জ্বল দিকও তার ছিল। সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও পোর্তুগিজরা অন্যান্য ইউরোপীয়দের মতো বর্ণবিদ্বেষে ভুগত না এবং বহুল পরিমাণে এদেশী মেয়েদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদের অনেকেই চিরতরে এদেশের বাসিন্দা হয়ে পুরোপুরি বাঙালী বনে গিয়েছে। তারা যদিও বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে খুব বেশি কিছু দেয় নি তবুও তারা দেশের কৃষির উন্নতিতে কথঞ্চিৎ সাহায্য করেছিল। অনেক সময় আমরা ধারণাই করতে পারি না যে বাঙলার অনেক সাধারণ ফুল ও ফলের গাছ পোর্তুগিজরা আনবার আগে বাঙলাদেশে কেউই তা দেখে নি। আলু, তামাক, কাজুবাদাম (হিজলি বাদাম), পেঁপে, আনারস, কামরাঙা প্রভৃতি পোর্তুগিজরাই এদেশে নিয়ে এসে চাষ করে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় পেয়ারা আর কৃষ্ণকলি। কিন্তু তারা যতরকম ফুল ও ফলের গাছ এনেছিল এগুলি তার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

বাঙলাভাষার শব্দভাণ্ডারে পোর্তুগিজদের দানও কম নয়। প্রচুর পোর্তুগিজ শব্দ বাঙলাভাষায় চিরদিনের মতো স্থান পেয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রী, যেমন চাবি, বালতি, পেরেক, সাবান প্রভৃতি পোর্তুগিজ নামেই চালু। আর বারান্দা ও জানালা শব্দ দুটি তাদের আদি সংস্কৃত বা বাঙলা শব্দকে একেবারেই উৎখাত করে দিয়েছে। এমনকি চেয়ার ও টেবিল, যা পোর্তুগিজরাই এদেশে চালু করে, তার পুরোনো কেদারা ও মেজ নাম দুটিও পোর্তুগিজ।

শুধু শব্দ ও ফলফুলই পোর্তুগিজরা বাঙলাকে দেয় নি। বাঙলার গদ্যের বিকাশে পোর্তুগিজ অবদানও যথেষ্ট। বাঙলাভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের জন্য আমরা একজন পোর্তুগিজের কাছে ঋণী। প্রথম বাঙলা গদ্যগ্রন্থ ও প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ ও অভিধানও পোর্তুগিজদের কীর্তি।

নানা দিক থেকে পোর্তুগিজরা ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন নিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে ইউরোপীয় দেশগুলির আগমন ও রাজ্যস্থাপনের প্রচেষ্টার প্রথম পথপ্রদর্শক পোর্তুগিজেরাই।

বাঙলায় ইংরেজ আগমন

ইংরেজরা বাঙলাদেশে ভারতে আসার বেশ কিছুদিন পরে এসেছিল। প্রথম দিকে তারা পশ্চিম ভারতেই নিজেদের কাজকারবার সীমাবদ্ধ রাখে। পূর্ব ভারতের ধনসমৃদ্ধি বা বাণিজ্যসমৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর তারা রাখত না। পোর্তুগিজদের বাঙলাদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান তাদের নজর এদেশের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু বহুদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করা ছাড়া ইংরেজ বণিকেরা বাঙলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে ব্যবসা করার কথা কাজে খাটাতে চায় নি। বিভিন্ন উপায়ে ও অন্যান্য বণিকদের মারফতই তারা বাঙলার বিখ্যাত বিভিন্ন ধরনের কাপড় ও অন্যান্য পণ্য কিনত। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দেই প্রথম সুস্পষ্টভাবে বাঙলার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার কথা ইংরেজরা বলে। কিন্তু তাতেও অনেক মতভেদ ও বাগবিতণ্ডা ইংরেজদের নিজেদের মধ্যে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলায় প্রথম কারখানা স্থাপন করে। ১৬৬০ সালের পর বাঙলায় ইংরেজের বাণিজ্য দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইংরেজদের বাণিজ্যের পরিমাণ দেড়গুণ বেড়ে যায়।

কিন্তু বাঙলার শুল্কসংগ্রাহক বালচাঁদের কাজকর্মের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় লোপ পায়। ইংরেজ-প্রতিনিধি তৎকালীন সুবাদার শায়েস্তা খানের সঙ্গে প্রতিকারের আশায় দেখা করেন। কিন্তু বিশেষ কোনো লাভ হয় না। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে

দেশী শাসকদের সঙ্গে বিবাদ না করলে যখন ব্যবসার উন্নতি হবে না, তখন আত্মরক্ষার উপযোগী এমন একটা বসতি স্থাপন করতে হবে যেখান থেকে সহজেই সমুদ্রে যাতায়াত করা যায়। সতেরো শতক পার হবার আগেই কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাব্যবস্থায় এই প্রতিজ্ঞাই পূর্ণ হয়। ইংলণ্ডেশ্বরও কোম্পানিকে ভারতীয় সম্রাটদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুমতি দেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয়টি সৈন্যবাহী জাহাজও ভারতে প্রেরিত হয়। এদের মধ্যে তিনটি বাঙলাদেশে পৌঁছয়।

ইংরেদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতির ফলে উভয় পক্ষের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে পড়ে। যুদ্ধ বাধার জন্যে দরকার খালি একটা ছুতো। হুগলির বাজারে ১৬৮৬ সালের অক্টোবর মাসে একদিন কুঠির তিনজন সৈন্য জিনিসপত্র কেনবার সময় আক্রান্ত ও নিহত হয়। একজন ইংরেজ ক্যাপটেন তাদের সাহায্য করতে গিয়ে বাধা পান হুগলির ফৌজদার আবদুল গনির কাছ থেকে। মোগল সৈন্যেরা কুঠির চারপাশের কুটির পুড়িয়ে দেয় এবং ইংরেজ জাহাজগুলির উপর গোলাবর্ষণ করে। ইংরেজরা এর প্রতিশোধ নেয় এবং হুগলির উপর কামান দেগে শহরের অনেকাংশই জ্বালিয়ে দেয়। মোগলেরা পরাজিত হয়, এবং ফৌজদার ছদ্মবেশে হুগলি ত্যাগ করেন। পরে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের মারফত ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেও ফৌজদারসাহেব নতুন সৈন্য ও সরঞ্জামের অপেক্ষা করছিলেন। ইংরেজরাও হুগলি থেকে পাততাড়ি গোটাবার ব্যবস্থা করছিল। ঐ বছরের ২০শে ডিসেম্বর হুগলি পরিত্যাগ করে চব্বিশ মাইল দক্ষিণে সুতানুটি গ্রামে ইংরেজরা তাঁবু ফেলল। সেখান থেকেই ইংরেজ প্রতিনিধি জব চার্নক্ শায়েস্তা খানের সঙ্গে আলাপ-

আলোচনা চালিয়ে যান। শায়েস্তা খান প্রথমে তেমন কোনো ভীতিপ্রদর্শন করেন নি। অবশেষে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখান। ৯ই ফেব্রুয়ারি জব চার্নক্ সুতানুটি ত্যাগ করে থানা-র (বর্তমান গার্ডেন রীচ) দুর্গ অধিকার করেন এবং মেদিনীপুরের হিজলি দ্বীপ দখল করেন। সেখানে ইংরেজরা অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন নামিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে। ১৬৮৭ সালের মে মাসে মোগল সৈন্য হিজলি আক্রমণ করে। সে-আক্রমণ যত না কাবু করুক ম্যালেরিয়া ইংরেজদের তার চেয়ে অনেক বেশি কাবু করে ফেলে। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে মোগল সেনাপতি শান্তি প্রার্থনা করে। ১১ই জুন ইংরেজরা তাদের সমস্ত কামান ও গোলাবারুদ নিয়ে হিজলি পরিত্যাগ করে। ১৬ই আগস্ট তারিখে শায়েস্তা খান ইংরেজদের উলুবেড়িয়াতে একটি দুর্গ নির্মাণের ও হুগলিতে আবার বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। শেষ পর্যন্ত শায়েস্তা খান তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করেন। এইভাবে এক বছর নষ্ট হয়। অবশেষে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর ইংরেজরা দ্বিতীয়বার কলকাতা ত্যাগ করেন বাঙলাদেশের সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য ও কুঠি পরিত্যাগ করে।

ইতিমধ্যে শায়েস্তা খান বাঙলা ত্যাগ করেছেন (১৬৮৮)। আওরঙ্গজেবও ইংরেজদের সন্তুষ্ট করে তাঁর সাম্রাজ্যে তাদের বাণিজ্য পুনঃস্থাপনের বন্দোবস্ত করতে বলেন। শায়েস্তা খান যে ইংরেজদের একেবারে তাড়ান নি এবং আওরঙ্গজেবও যে এই নির্দেশ দিলেন তার কারণ কিন্তু এক। অর্থাৎ বিদেশী বণিকদের দেওয়া কর বাবদ মোটা টাকা সম্রাটের রাজকোষে জমা হওয়া। এই করের লোভেই তাঁরা বিদেশী বণিকদের উৎসাহ দিতেন। ফলে বাঙলার পরবর্তী সুবাদারেরা

ইংরেজদের বাঙলায় এসে বাণিজ্য করবার জন্যে মাদ্রাজে চিঠি লেখেন। অবশেষে ১৬৯০ সালে জব চার্নক আবার বাঙলায় এলেন ও কলকাতা শহুরের পত্তন করলেন।

ঐ বছরই ফরাসীরাও চন্দননগরে একটা ছোটোখাটো কিন্তু স্বাধীন বসতি স্থাপন করলেন। ফরাসীরাও বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় ওলন্দাজদের সঙ্গে সমান সুবিধায় একই শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করবার অনুমতি পান।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পনেরো বছর এক-নাগাড়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চালাবার ফলে ও মারাঠাদের হাতে বারবার বিখ্যাত মোগল সেনাপতিদের পরাজয়ের ফলে মোগল সরকারের সম্মান ভেঙে পড়তে থাকে। সব জায়গাতেই আইন-ও-শৃঙ্খলাবিরোধী লোকেরা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। এবং বাঙলার তৎকালীন সুবাদার ইব্রাহিম খানের শান্তিপ্রিয় চরিত্র ও শাসনে বাঙলায় একটি অভ্যুত্থান ঘটে, যা শাহজাহানের বিদ্রোহের পরেকার বাঙলার দীর্ঘকালের অটুট শান্তি ভেঙে দেয়।

এই অভ্যুত্থানের নেতা শোভা সিং মেদিনীপুরের ঘাটাল-চন্দ্রকোণার জমিদার ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার পাঠানদের নেতা রহিম খানের সাহায্য পান। প্রথম দিকে সুবাদার একে তেমন একটা সাংঘাতিক কিছু মনে করেন নি। শেষে বাঙলার ফৌজদার যখন শোভা সিংএর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন তখন তাঁর দলে আরও লোক যোগ দিয়েছে। হুগলিতে ফৌজদার আশ্রয় নেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে ফৌজদার ও সৈন্যদল হুগলি দুর্গ ত্যাগ করে চলে যান (জুলাই ১৬৯৬)। তখন শোভা সিং দলবল নিয়ে হুগলি দখল ও লুণ্ঠন

করেন। অবশেষে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সাহায্যে শোভা সিংকে হুগলি থেকে বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরের জায়গাগুলি বিদ্রোহীদের দখলে থাকে। তারা প্রায়ই চন্দননগর-দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত হামলা চালাত। শোভা সিং প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই হুগলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কর ও শুল্ক আদায় করতেন। শোভা সিং ১৬৯৬ সালের শেষ দিকে বর্ধমান ফিরে যান ও অপমান করতে গিয়ে বর্ধমানের রাজকন্যার হাতে নিহত হন। তারপরে তাঁর ভাই অকর্মণ্য ও লম্পট হিম্মত সিং রাজা হন। কিন্তু এঁদের অনুচরেরা রহিম খানকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। রহিম খান উত্তরে এগিয়ে মালদা পর্যন্ত দখল করেন। হুগলির আশেপাশেও অরাজকতা চলতে থাকে। অবশেষে ইব্রাহিম খানের পরিবর্তে সম্রাটের পৌত্র আজিমুদ্দিন সুবাদার হয়ে আসেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু আজিমুদ্দিনের দুর্ব্যবহারে তিনি সৈনাপত্য ত্যাগ করে বাঙলাদেশ ছেড়ে যান। এরপর মোগলসৈন্য আরও কিছুদিন টালবাহানা করে কাটায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৯৮ সালে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

এই সমস্ত গোলযোগের যে ফল বাঙলার ইতিহাসে হয়তো অভূতপূর্ব এবং সে ফল বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যখন শৃঙ্খলাভঙ্গ হল এবং মোগল শাসন ভেঙে পড়ল তখন বাঙলাদেশের তিনটি ইউরোপীয় বসতি—কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়া—ঢাকায় ইব্রাহিম খানের নিকট নিজেদের কুঠিগুলো সুরক্ষিত করবার অনুমতি চায়। সুবাদার সাধারণভাবে

তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন। ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট দরলেআঁ (চন্দননগর) ও চুঁচুড়ার ছুর্গের এই হল সূত্রপাত। কলকাতায় ইংরেজ বণিকেরা তাদের ছুর্গের চারপাশে প্রাচীর ও বুরুজ তৈরি করে। অনেক জায়গায় পাশের মাটির ঢিপির উপর কামান বসায় এবং পুরোনো খোড়ো ঘরের, যার মধ্যে কোম্পানির জিনিসপত্র ও রসদ রাখা হত, বদলে ইটের বাড়ি ও দেয়াল তৈরি করে। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে টাকার বিনিময়ে ইংরেজ আজিমুদ্দিনের কাছ থেকে স্থতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের কর আদায়ের অধিকার এক ফরমানের সাহায্যে নিজেদের হাতে নিল। এইভাবে কলকাতার নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়।

চন্দননগরে ফরাসীরাও পাকা দেয়াল তুলল নিজেদের আবাসের চারপাশে এবং নদীর দিকেও বুরুজ তৈরি করল। ১৬৯৭ সালের এপ্রিল মাসে চন্দননগরের চার কোনায় আরও বুরুজ তৈরি করা হয়। সেজন্যে শহরটা একটা ছুর্গের চেহারা নেয়। ঠিক ঐ ভাবেই ওলন্দাজেরাও তাদের চুঁচুড়ার কুঠি স্থরক্ষিত করে তোলে। এই তিন শক্তিই নিজের সামান্যসংখ্যক শাদা সৈন্য ও জাহাজীদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে এদেশীয় সৈন্য নিয়োগ করতেন। এর-পরে দেখা গেল এমন এক দৃশ্য যা অবিশ্বাস্য অথচ সত্য। দেশের সার্বভৌম শাসক প্রজাদের রক্ষা করতে পারছেন না এবং প্রত্যেকটি ভারতীয় ধনীব্যক্তি ও আশপাশের যে-যে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব সকলেই নিজেদের জীবন ও সম্মান বাঁচাবার জন্যে বিদেশীদের ছুর্গে আশ্রয় নিতে লাগলেন।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হবার সূচনা মোটের উপর এই সময় থেকে। এর মধ্যে নিজেদের ধনবলে ও সমুদ্রবাণিজ্যে

একাধিপত্যের ফলে বিদেশীরা বাঙলাদেশের বাণিজ্যেও একাধিপত্য তখন প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। দেশীয় বণিকেরা নানা কারণে বিদেশী বণিকদের প্রভাব বিস্তার রোধ করতে পারেন নি। এর একটা বড়ো কারণ সমুদ্রবাণিজ্যের সাহায্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের অসুবিধা; এবং দেশের আভ্যন্তরিক অরাজকতাও কখনই বাণিজ্যের সহায়ক ছিল না। বিশেষ করে ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের দেশের রাজশক্তির সমর্থন পেয়েছিল। তাছাড়া এদেশের বাজারে অঢেল টাকা ঢালবার যে-ক্ষমতা তাদের ছিল সেটা অন্যান্য বণিকদের ছিল না। ইংরেজও শুধু ইউরোপে নয়, ভারতবর্ষেও প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য বণিকদের হটিয়ে দিয়ে এদেশের বাণিজ্যে এক-চেটিয়া অধিকার লাভের চেষ্টা করছিল। পরে তাদের মাথায় এল, অবাধ বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে এই দেশটাও বোধহয় নিজেদের কুক্ষিগত করা যায়। এই নীতির পরিণাম বাঙলার শাসকদের সঙ্গে বিদেশী বণিক, বিশেষ করে ইংরেজের কলহ ও শক্তিপরীক্ষায়, আর তার অবসান পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভে ও বাঙলার তখততাউস অধিকারে। দুশো বছরের জন্যে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাসের আরম্ভ, বাঙলাদেশে আঠারো শতকের শুরু থেকে ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের সূত্রপাত।

মুরশিদকুলি খান

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুরশিদকুলি খান বাঙলার সুবাদার হয়ে আসেন এবং ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাঙলার এক নতুন স্বাধীন নবাব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মারা যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন সারা মোগল-সাম্রাজ্য অরাজকতার ভারে মুহ্যমান তখন বাঙলাদেশ মুরশিদকুলি ও আলিবর্দি খানের মতো দুজন বিচক্ষণ শাসকের অধীনে অরাজকতা ও অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল এঁরা দুজনে বাঙলাদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁরা বাঙলায় শান্তি বজায় রেখেছিলেন, দেশের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিলেন এবং শাসনব্যবস্থা এমন এক নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যা ইংরেজ আমলেও বহুদিন টিকে ছিল। যে ভূমি-ব্যবস্থা ইংরেজরা গ্রহণ করেছিলেন তা প্রধানত ছিল মুরশিদকুলি খানেরই সৃষ্টি।

মুরশিদকুলি ও আলিবর্দির শাসনে বাঙালী শান্তি পেয়েছিল। দিল্লীর রাজতক্ত নিয়ে হানাহানির ঢেউ বাঙলায় পৌঁছয় নি। মধ্য ও পশ্চিম ভারত যে মারাঠা আক্রমণে বিধ্বস্ত ও আলোড়িত হয়েছিল সে আক্রমণের ঢেউও বাঙলার পশ্চিম সীমা স্পর্শ করেই পিছিয়ে গিয়েছিল (১৭৪৩-৫২) একটা ঝড়ের আঘাতের মতো। শুধু উড়িষ্যাই সে আক্রমণে বাঙলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু মুরশিদকুলি বাঙলারাজ্যের আয় বাড়ালেও, কর আদায় চিরস্থায়ী ও সহজতর করলেও, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল প্রসার

ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটালেও পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোয় তাঁকে একজন অতি সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী, করসংগ্রাহক ও হিসাবরক্ষকের বেশি কিছু বলা যায় না। মহৎ রাষ্ট্রনায়কের দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। সেই জন্যে তিনি নিজের সৃষ্ট ব্যবস্থাকে স্থায়ী করবার কোনো বন্দোবস্ত করেন নি ; আমলাবৃন্দ, এমনকি কোনো স্বেচ্ছাচারীর হাত থেকে রাজ্য রক্ষার জন্যও কোনো কিছুই করেন নি। আর সবচেয়ে বেশি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙলার সামরিক শক্তির উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে এবং সৈন্য-সংখ্যা কমিয়ে। ফলে পরবর্তী শাসনকর্তারা বিদ্রোহ দমনে বা শত্রু প্রতিরোধে অসুবিধায় পড়তেন।

মুরশিদকুলি খান প্রথম বাঙলাদেশে এসে দেখলেন (১৭০০ খ্রীঃ) যে সরকার দেশের ভূমিরাজস্ব থেকে কোনো আয় করতে পারে না। সারা দেশটাই সরকারী কর্মচারীদের মাইনের বদলে জায়গির হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজকোষে টাকা আসত একমাত্র শুল্ক থেকেই। এইজন্যে ইউরোপীয় বণিকদের উপর সুবাদার ও দেওয়ানেরা এত চাপ দিতেন।

রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মুরশিদকুলি দুধারা পরিকল্পনা করলেন। প্রথম ব্যবস্থা হল বাঙলার সমস্ত জায়গিরগুলিকে খালসায় বা রাজকীয় খাসমহলে রূপান্তরিত করা এবং কর্মচারীদের উড়িষ্যায় জায়গির দেওয়া। দ্বিতীয়ত তিনি ভূমিরাজস্ব আদায় করবার জন্য চুক্তি বা কনট্রাক্টের ব্যবস্থা করলেন (ইজারাদারি ব্যবস্থা)। এর আগে রাষ্ট্র ভূমি থেকে একদফায় তার প্রাপ্য পেত 'জমিদার' নামধারী পুরোনো ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে। এইসব জমিদারদের অনেকে ছিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাচীন হিন্দুবংশের বংশধর। কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন

মোগল আধিপত্য শুরু হবার আগেকার পুরোনো হিন্দু ও মুসলমান স্থানীয় রাজ-কর্মচারীদের বংশধর। সমস্ত অভিজাতবর্গের মতোই এইসব লোকেরা সে সময়ে আলসেমি, বিলাসব্যসন ও আনুষঙ্গিক দোষে আবিল হয়ে গেছেন। পুরোনো জমিদারেরা যদি ভূমির ভার নিয়ে থাকেন তাহলে ভূমি থেকে আয়ের আদায় বা নিয়মিতি সম্পর্কে রাষ্ট্র নিশ্চিত হতে পারে না। তাছাড়া উত্তর ভারতে যে তোডরমলীয় ব্যবস্থায় সরাসরি কৃষকের কাছে থেকে রাজকর্মচারীরা কর আদায় করতেন তা বাঙলায় চলত না। সেজন্যে মুরশিদকুলি ইজারাদারদের কাছ থেকে নিরাপত্তা বণ্ড লিখিয়ে নিতেন। এই তাঁর 'মাল জামিনি' ব্যবস্থা। অনেক পুরোনো ভূম্যধিকারীরা রইলেন,—কিন্তু এইসব ইজারাদারদের হাতের মুঠোয়, এবং আস্তে আস্তে তাঁরাও বিলোপ পেয়ে যান। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে এইসব ইজারাদারেরা জমিদার নামে অভিহিত হলেন এবং তাঁদের অনেকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন যদিও তাঁরা কেউই রাজবংশধর ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন নিছক রাজকর্মচারী—যাঁরা আদায়ের একটা শতকরা ভাগ মাত্র পেতেন। সত্যি বলতে কি, মুরশিদকুলির ভূমিব্যবস্থা ও কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলার ঐতিহাসিক ভূম্যধিকারীরা প্রায় সব শেষ হয়ে যান এবং নতুন রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি তাঁদের স্থান গ্রহণ করেন। ইজারাদার বেছে নেবার বেলায় মুরশিদকুলি সব সময়েই হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিতেন। কারণ, দেখা গিয়েছিল তাঁর আগের প্রায় সব মুসলমান কর-আদায়কারীরাই সে টাকা মেরে দিতেন, তা আর আদায় করা যেত না। এইভাবে তিনি এক নতুন ভূমিপতি অভিজাতবর্গের সৃষ্টি করলেন যাদের অবস্থা কর্নওয়ালিসের হাতে স্বীকৃতি ও উত্তরাধিকারের অধিকার পেল।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার দেওয়ান হিসেবে পাকাপাকিভাবে মুরশিদকুলি যখন আবার এলেন তখন বাঙলার হিন্দুসমাজে আর-একটি পরিবর্তন দেখা গেল। এর আগে পর্যন্ত মোগল শাসনব্যবস্থায় সমস্ত উঁচু পদগুলিই—কেবল সেনাবাহিনী ও আইনবিভাগেই নয়, এই প্রদেশের রাজস্ব ও হিসাব বিভাগে, এমনকি সেনাবাহিনীর রসদ জোগানোরও দপ্তরে—আগ্রা, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গা থেকে লোক এনে ভরতি করা হত। এরা বাঙলায় বসতি স্থাপন করত না। বিভিন্ন সুবাদারদের সঙ্গে আসত আর যেত। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদকুলি ও পরবর্তী নবাবদের আমলে। বাঙালী হিন্দুরা নিজেদের গুণ ও ফারসীজ্ঞানের জোরে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদ অধিকার করেন। সুবাদারের অধীনে এবং ফৌজদারের অধীনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদও দখল করেন। হুসেন শাহের আমলেও (১৫১০ খ্রীঃ) এরকম ঘটেছিল। মুরশিদকুলির আমলে এইসব হিন্দুরা নতুন জমিদার-বংশ স্থাপন করার মতো সমৃদ্ধিশালী হয়েছিলেন। এইসব অভিজাত-হওয়া সরকারী আমলারা ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, এমনকি ময়রা জাতেরও—এঁদেরই বংশধরেরা রাজা নামে এখন অভিহিত হলেন। পরবর্তী নবাবদের আমলে একাধিক বাঙালী হিন্দু রায়-ই-রায়ান হয়েছিলেন রাজ-কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়ে। উপরিউক্ত তিন জাতের হিন্দুদের মধ্যে এত বেশি বাঙালী রায়-ই-রায়ানদের থেকে নিজেদের বংশতালিকা টানেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ঢাকার ও পূর্ণিয়ার নবাবদের মতোই জেলা শাসকদের অধীনে কর্মচারী ছিলেন বলে মনে হয়। বরিশালের গাভার কায়স্থ ঘোষেদের উপাধি দস্তিদার, কারণ একসময়ে নবাবী আমলে বাঙলার নৌবাহিনীর আলোর ভার তাঁদের উপর ছিল।

বকসী, সরকার, কানুনগো, চাকলাদার, তরফদার, মুনসী, লস্কর ও খান (!) প্রভৃতি পুরোনো সরকারী পদসূচক নাম এখনো বহু হিন্দু পরিবারের বংশানুক্রমিক পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে নবাবী আমলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাজ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করছে।

হিসাবপত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির প্রতি নজর ছাড়াও মুরশিদকুলির রাজস্ব-ব্যাপারে সাফল্যের ও সমৃদ্ধির একটি কারণ ছিল অক্ষম ব্যক্তির উপর অত্যন্ত কড়া ব্যবহার ও অমানুষিক অত্যাচার। পরবর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আরও একটি কারণ তাঁর শাসন-ব্যয়সংকোচ। আদায়ের খরচা একেবারেই ছিল না বলা চলে। আসলে এর ফল হল চাষীদের আরও বেশি শোষণ। তিনি সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন অবশ্য কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু যখনই কোনো বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটত তখনই অসুবিধায় পড়তে হত।

১৭১৭ সাল বাঙলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই সময়ে বাঙলাদেশ কার্যত স্বাধীন হয়ে যায় এবং বাৎসরিক অতিরিক্ত রাজস্বটুকু পাঠিয়ে দিল্লীর আধিপত্য থেকে মুক্তি পায়। ফলে দুমুখো শোষণের হাত থেকে বাঙলাদেশ নিষ্কৃতি পেল। দুই শাসকের বদলে এক শাসককে কর দেওয়ায় বাঙলার অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থাও অনেকটা স্থিতিশীল হল। এছাড়া মুরশিদ-কুলি সমস্ত বেআইনি কর বা রাজস্ববহির্ভূত আদায় নিষিদ্ধ করেন। তিনি বাণিজ্যের উপর তাঁর পূর্ববর্তীদের যে একচেটিয়া অধিকার ছিল তাও রহিত করেন। মুরশিদকুলির নিজস্ব আয়ও ছিল অনেক কম। জাঁকজমক ও ব্যয়বাহুল্য কমানোর ফলেই তিনি প্রজাদের

অতিরিক্ত শোষণ না করে পারতেন। ফলে তাঁর ও আলিবর্দির আমলে (১৭১৬-১৭৫৬) বাঙালী হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার ও সমৃদ্ধির একটু সুযোগ পায়।

কিন্তু তাই বলে আপামরসাধারণ সব বাঙালীই যে সমৃদ্ধির মুখ দেখল তা নয়। দিল্লীতে যে রাজস্ব যেত তা মুদ্রায় পাঠানো হত। ফলে দেশী ও বিদেশী বণিকে বাঙলাদেশে যে বিরাট টাকা ঢেলেছিলেন বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে তা বাঙলাদেশে থাকত না, বাঙালীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও তা সহায়ক হত না। বাঙলাদেশে যে টাকা চালু থাকত তার পরিমাণ স্বভাবতই ছিল অতি সামান্য। উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেলেও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা সেই অনুপাতে বাড়তে পেত না। সাধারণ মানুষের তাই অর্থনৈতিক স্থিতির কোনো উপায় ছিল না, আরও উন্নতির জন্যে কোনো পুঁজি ছিল না। কারণ তারা পুঁজি বা রৌপ্যমুদ্রা জমাতে পারত না, যদিও কৃষিতে নিযুক্ত জমির পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভূমিরাজস্বের পরিমাণ অত বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল চাষীদের কাছ থেকে নির্দয়ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে এবং ইজারাদার প্রভৃতিদের উপর অত্যাচার করে। চাষীর পরে অত্যাচার শুধু মুরশিদকুলির সময়েই নয়, সারা মোগল শাসনেই হত। এবং বাঙলার চাষী ও অন্যান্য কারিগরদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েই উপরতলার আপাতসমৃদ্ধির জৌলুসে চোখ ধাঁধানোর বন্দোবস্ত হয়েছিল। নিচের কালো অন্ধকার কখনোই কাটে নি। মুরশিদকুলি ও পরবর্তী নবাবী আমলে, এমনকি তারও পরে, উপরতলায় টাকা আদায়ের জন্য যে-চাপ পড়ত তা স্বাভাবিকভাবেই পরপর

প্রত্যেকটি মধ্যস্বত্বভোগীর ভিতর দিয়ে গিয়ে পৌঁছত আসল উৎপাদক চাষীদের উপর। কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্যে তাদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই রেখে বাকি সমস্ত সম্পদই রাষ্ট্র আদায় করে নিত। ফলে দিল্লী ও মুরশিদাবাদের জাঁকজমক যতই বাড়ুক, যতই প্রতি বছর মুরশিদকুলি কোষাগারে ধনরত্নের পরিমাণ বাড়ান, জনসাধারণ প্রায় ততই নির্জীব হয়ে পড়ত আর অর্ধাহারে-অনাহারে প্রাণ দিত। নবাব-কোষাগারের হীরামানিক আর সোনারুপার পাহাড় লর্ড ক্লাইভের চোখ ঝলসালেও বাঙলা-দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সে ধন কোনো কাজেই আসে নি। এবং মীরজাফর ও মীরকাশিমের আমলে এই বিপুল সম্পদ ইংরেজদের পকেট ভরতি করতে ইংলণ্ডে চালান যায় ইংরেজ পুঁজিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সমৃদ্ধির মূলে জল সেচন করতে। আর এই-ই হল আঠারো শতকের প্রথমার্ধের বাঙলার আসল লাভ।

পুঁজির অভাব যেমন ছিল তেমনি নিরাপত্তার অভাবও ছিল। আগেও যেমন, এখনো তেমনি পোর্তুগিজ, আরমেনিয়ান, পারসিক ও হিন্দু বণিকেরা কলকাতা প্রভৃতি বিদেশীদের সুরক্ষিত শহরে এসে এসে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্য চালাত ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ার নিরাপত্তায়। দেশী বণিকরা অনেকেই বিরাট ধনবান হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে তাঁরা কখনোই বিদেশী, বিশেষ করে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না।

বিদেশী এলাকাগুলির নিরাপদ শাসন দেশীয় লোকদের কলকাতা প্রভৃতি শহরে বাস করতে উৎসাহী করে। ফলে ১৭৫০ সালে কলকাতার জনসংখ্যা হাজার পনেরো থেকে এক লাখেরও বেশি হয়। হুগলি সেসময়ে মুরশিবাদের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে ওঠে।

পারসিক শিয়া মুসলমানেরা সকলেই হুগলিতেই আস্তানা গাড়তেন এবং হুগলি পারসিক সংস্কৃতির ও তত্ত্বাদর্শের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এই সময়ে ওলন্দাজ বণিকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজের নিকট হার মানে এবং বাঙলার বাণিজ্য জগৎ থেকে ইংরেজকে পথ ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেয়। প্রায় একশো বছর ধরে বাণিজ্য করবার পর, চুঁচুড়াকে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করে এরা বাঙলা থেকে বিদায় নিল।

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবস্থা ১৭০০ থেকে ১৭৪০ পর্যন্ত খুব সঙিন ছিল। তারপর ডুপ্লে ও ডুমা এসে সে-অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। অবশ্য ১৭২২ সালে পাওয়া একটি ফরমান এ-ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

এই সময়ে অস্টেন্‌ড্‌ কোম্পানি নামে একটি ইউরোপীয় কোম্পানি বারাকপুরের নিকটবর্তী বাঁকিবাজারে ঘাঁটি স্থাপন করে দারুণ ব্যবসা করতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধতার ফলে বাঙলার ফৌজদার ১৭৪৪ সালে তাদের উৎখাত করে ছাড়েন।

নবাবী আমলের শেষ অঙ্ক

মুরশিদকুলি খান ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন মারা যান। তার পর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর জামাই সুজাউদ্‌দিন মহম্মদ খান বাঙলার নবাব হন। মুরশিদকুলির ইচ্ছা ছিল নাতি সরফরাজ তাঁর অবর্তমানে বাঙলার মসনদে বসেন। কিন্তু সে-বাসনা সফল হয় নি। সুজাউদ্‌দিনের আমলে আলিবর্দি আস্তে আস্তে ক্ষমতায় বাড়তে থাকেন। আলিবর্দির পরামর্শ ছাড়া কোনো রাজকার্যই হত না। আরো কয়েকজন, আলিবর্দি-ভ্রাতা হাজি আহমদ, দেওয়ান রায়-ই-রায়ান আলমচাঁদ ও মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনপতি জগৎ শেঠ, ফতেচাঁদ ক্রমে রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে থাকেন। বিশেষ করে জগৎ শেঠ টাকার জোরে শুধু নবাবদের উপরই নয়, বাঙলার ইতিহাসেরও উপরও বেশ প্রভাব বিস্তার করেন।

নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সুজাউদ্দিন মুরশিদকুলির আমলের কড়াকড়ি কমান এবং জমিদারদের সঙ্গে অনেক বেশি ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেন। তাঁর এইসব সংকাজের জন্যে তিনি জনপ্রিয় সুশাসক হিসাবে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কতকগুলি দোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় শেষ দিকে তিনি রাষ্ট্রব্যাপারে বিশেষ কোনো নজর দিতেন না এবং ধীরে ধীরে হাজী আহমদ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের হাতে সমস্ত রাজ্যশাসনভার চলে যায়। আর এঁরা অল্পকিছু দিনের ভিতরেই নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে নানান ষড়যন্ত্র করে বাঙলার রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে ঘুন ধরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে বিদেশী বণিকদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাঙলাদেশে শুধু ফরাসী আর ইংরেজ বণিকেরাই ঘাঁটি বজায় রাখতে পারে। নবাবের সঙ্গে প্রায়ই তাদের ছোটোখাটো সংঘর্ষ বাধত। কিন্তু মোটের উপর ইংরেজ বণিকদের অবস্থা ভালো হতে থাকে।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্‌দিনের মৃত্যুতে সরফরাজ নবাব হন। কিন্তু কামুক সরফরাজের সময়ের অধিকাংশ কাটত হারেমের ভিতরে। রাষ্ট্রের কোনো কিছুই তিনি দেখতেন না। সে যোগ্যতা ও ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমীরওমরাহদের চক্রান্তে সরফরাজ সিংহাসন-চ্যুত হলেন; ১৭৪০ সালের মার্চ মাসে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে আলিবর্দি বাংলার মসনদ অধিকার করলেন। আলিবর্দি নির্বিবাদে রাজ্যশাসন করতে পারেন নি। উড়িষ্যাবিজয় ও মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই তাঁর জীবন কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ সালে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি বাঙলাদেশকে বর্গীর আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত করেন। রাজ্যের অভ্যন্তরেও অশান্তি ছিল। আফগান সৈন্যেরা একবার বি[illegible] করে। সে বিদ্রোহ তিনি কঠোরভাবে দমন করেন। পারিবারি[illegible] অশান্তি ও অসুস্থতায় বৃদ্ধ নবাবের আয়ু ফুরিয়ে আসে এবং ১৭৫[illegible] সালে আলিবর্দি আশি বছর বয়সে মারা যান। আলিবর্দি শাসনকা[illegible] বিদেশী বণিকদের সঙ্গে মোটের উপর ভালো ব্যবহার করতেন মারাঠা আক্রমণের মতো সংকট সময়ে নেহাত দায়ে না ঠেক[illegible] তিনি কখনো তাদের উপর অতিরিক্ত কর চাপান নি। তাঁর রাজ[illegible] পূর্ববর্তীদের মতোই তিনি বাঙালী হিন্দুদের অনেক উঁচু রাজপ[illegible]

অধিষ্ঠিত করেন। তবু মনে হয় অনেক জমিদার ও ব্যবসায়ী তাঁর উপর কিছু না কিছু অসন্তুষ্ট ছিল।

আলিবর্দির মৃত্যুর পর বাঙলার মসনদে বসেন সিরাজউদ্দৌলা—বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব। সিরাজ মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহবিবাদ বেধে গেল। সিরাজ এক-এক করে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকেই দুর্বল করে ফেলেন ও কিছু পরিমাণে নিজের আসন নিরাপদ করেন। কিন্তু বহিরাগত বিপদও কম ছিল না। মসনদে বসার অল্প কিছুদিন বাদেই কলকাতার ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সিরাজ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে তিনি কলকাতা অবরোধ ও অধিকার করেন। ফলে ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সিরাজের নিজের আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীরা বিশেষ করে মাসী ঘসেটি বেগম ও প্রধান সেনাপতি মীর জাফর এবং জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ এই ষড়যন্ত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ রূপ গ্রহণ করে পলাশির যুদ্ধে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঘটে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশও তার স্বাধীনতা হারায়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয়। সিরাজ পালান, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়েন ও নৃশংসভাবে নিহত হন। ব্যক্তিগত অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সিরাজ অন্তত বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, বিদেশী শক্তিকে ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। তাঁর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশ যে পরাধীন হল সে পরাধীনতার ও সিরাজের স্বাধীনতারক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য বাঙালী দিয়েছে দুশো বছর ধরে।